নিজে বাঁচুন পরিবার বাঁচান
সালহে আল মুনাজ্জিদ

অনুবাদক পরিচিতি

মুফতী মুহাম্মদ মামুনুর রশীদ। জন্ম ১৯৮৬ইং সনের ২১ সেপ্টেম্বর। প্রাচীন বাংলার রজধানী সোনারগাঁও এর লক্ষ্মীবরদী গ্রামে।

লেখা-পড়ার হাতেখড়ি স্থানীয় মাদরাসা ভিটিপাড়া ইসলামিয়া ইবরাহীমিয়া মাদরাসা'য় । প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করে চলে আসেন ঢাকায়। বাবা সোহরাব উদ্দীনের ব্যবসাস্থল খিলগাঁও হওয়ার সুবাদে ভর্তি হন জামিয়া ইসলামিয়া মাখজানুল উলূম খিলগাঁও'-এ । সেখান থেকেই দারওরায়ে হাদীস শেষ করেন এবং পবিত্র কুরআনের তাফসীর বিষয়ক উচ্চতর ডিগ্রি লাভ করেন। অতঃপর সাভারের 'দারুত তাখাসসুস আল-মান্নানিয়া আল-ইসলামিয়া' থেকে ইসলামী আইন শাস্ত্রের উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করেন।

'মাগফিরাতের বিস্ময়কর ঘটনাবলী' অনুবাদকের প্রথম অনুবাদ। 'নারীর বেহেশতী সাজ' প্রথম প্রকাশনা। রচনা সংকলন, সম্পাদনা ও অনুবাদসহ তার বেশ কয়েকটি বই এখন বাজারে।

বর্তমানে তিনি 'জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলূম, দক্ষিণগাঁও, বাসাবো, ঢাকা-১২১৪-এ খেদমতে নিয়োজিত আছেন।

মুহাম্মাদ দিলাওয়ার হুসাইন
পরিচালক, হুদহুদ প্রকাশন

নিজে বাঁচুন পরিবার বাঁচান

মূল
শায়খ মুহাম্মাদ সালেহ আল মুনাজ্জিদ
ইমাম ও খতীব : মসজিদে উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহ.

ভাষান্তর
মুফতী মুহাম্মাদ মামুনুর রশীদ
জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলূম
দক্ষিণগাঁও, ঢাকা-১২১৪

নিজে বাঁচুন পরিবার বাঁচান

মূল
শায়খ মুহাম্মাদ সালেহ আল মুনাজ্জিদ
ইমাম ও খতীব : মসজিদে উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহ.

ভাষান্তর ও সম্পাদনা
মুফতী মুহাম্মাদ মামুনুর রশীদ

প্রকাশনা
৫৮ [আটান্ন]

প্রকাশকাল
আগস্ট ২০১৮

প্রকাশক
হুদহুদ প্রকাশন
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা
০১৭৮৩৬৫৫৫৫৫, ০১৯৭৩ ৬৭৫৫৫৫

প্রচ্ছদ
শাহ ইফতেখার তারিক

মুদ্রণ
আফতাব আর্ট প্রেস
২৬ তণুগঞ্জ লেন, ঢাকা

মূল্য ২০০ টাকা মাত্র

بسم الله الرحمن الرحيم

অর্পণ

কুরআনের খেদমতে জীবন উৎসর্গকারী,

উস্তাযে মুহতারাম

মাওলানা আজিজুল্লাহ رحمه الله

এর রূহের মাগফিরাত ও জান্নাতে উঁচু মাকাম কামনায়...

–মুহাম্মাদ মামুনুর রশীদ

নিজে বাঁচুন, পরিবার বাঁচান

নব্বই বছর বয়সী এক ভদ্রলোক বহুতল বিশিষ্ট প্রাসাদ নির্মাণ করছেন। প্রতি মুহূর্তে তিনি কাজের তদারকী করেন। আপনি গিয়ে যদি তাকে জিজ্ঞেস করেন, চাচা! এই ভবনটি কতদিন টেকসই হবে?

জওয়াবে তিনি বলবেন, যে মানের রড-সিমেন্ট দিলাম, ইনশা আল্লাহ দুই/তিনশ' বছরে কিছু হবে না।

আপনি যদি আবার জিজ্ঞেস করেন, আচ্ছা, আপনার তো বয়স মোটামুটি বেশ হয়েছে। এখন এত বিশাল প্রাসাদ কার জন্য নির্মাণ করছেন?

জওয়াবে তিনি বলবেন, আমার তো সময় শেষ হয়ে গেছে। আমি এর নির্মাণ শেষ হওয়া দেখে যেতে পারব কি না, তাও বলতে পারছি না। এটা করছি ছেলেপিলের জন্য। আমার মৃত্যুর পর ওরা যাতে দু'দণ্ড সুখে থাকতে পারে, সেজন্য। আমার মৃত্যুর পর ওদের কী হবে, সেটাই তো ভাবি সবসময়।

আজ বেশিরভাগ মুসলমানের অবস্থা এমনই। সন্তানের দুনিয়াবী সুখসমৃদ্ধির চিন্তায় সবাই বিভোর। অথচ মুসলমানের দুনিয়ায় আগমন আখেরাতের প্রস্তুতির জন্য। 'আমার মৃত্যুর পর আমার কী অবস্থা হবে এবং সন্তানাদির মৃত্যুর পর তাদের কী অবস্থা হবে?' এটাই হচ্ছে মুসলমানের প্রকৃত ভাবনা। কিন্তু আমরা সেকথা ভুলে গেছি।

শায়খ মুহাম্মাদ সালেহ আল মুনাজ্জিদ (ইমাম ও খতীব : মসজিদ উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহ.) মুসলমানদেরকে বিস্মৃত সেই কথা স্মরণ করে দেওয়ার জন্য একটি পুস্তিকা রচনা করেছেন। আমার সেটার অনুবাদ এখন আপনাদের হাতে তুলে দিচ্ছি।

এর আগে আমরা লেখকের বেশকিছু গ্রন্থের অনুবাদ আপনাদের হাতে

তুলে দিতে সক্ষম হয়েছি। সেগুলো পাঠকসমাজ যেভাবে গ্রহণ করেছেন, তাতে আমরা মুগ্ধ। আশা করছি, আগের গ্রন্থগুলোর মত এই পুস্তিকাটিও পাঠকসমাজ সমাদরের সাথে গ্রহণ করবেন।

মুসলিম অভিভাবকরা এখন পরিবারের পরকালীন তারবিয়াতের ব্যাপারে যে পরিমাণ উদাসীন, সে অনুযায়ী এই পুস্তিকা প্রত্যেক ঘরে ঘরে পৌঁছে যাওয়া বাঞ্ছনীয়। আশা করি, পাঠকসমাজ বিষয়টি বিবেচনায় রাখবেন।

হুদহুদ প্রকাশনের সূচনালগ্ন থেকে একটি কথা আমরা বারবার বলে আসছি। তা হল আমাদের কোন বই পড়ে যদি আপনি আলোড়িত হন– সেই আলোড়ন ইতিবাচক হোক, অথবা নেতিবাচক– আমাদেরকে যেকোন উপায়ে বিষয়টি অবগত করুন। এতে হয়তো আমরা উৎসাহিত হব, অথবা সতর্ক হব। এখন সেই আবেদনটি আপনাদের কাছে আবারও পেশ করছি।

বক্ষমাণ পুস্তিকাটি অনুবাদ করেছেন আমাদের অত্যন্ত আস্থাভাজন আলেমে দীন মাওলানা মুফতী মামুনুর রশীদ। তিনি ঢাকার একটি প্রতিষ্ঠিত মাদরাসার সিনিয়র উস্তাদ। এ ছাড়া এর অঙ্গসজ্জার যাবতীয় কাজ করেছেন হুদহুদ প্রকাশনের পরিচালক মাওলানা দিলাওয়ার হোসাইন। আমরা এ দু'জনকে অন্তরের গভীর থেকে অভিবাদন জ্ঞাপন করছি।

পরিশেষে আল্লাহ তাআলার কাছে দোআ করছি, তিনি আমাদের এই মেহনত কবুল করুন এবং সংশ্লিষ্ট সবাইকে পরিপূর্ণ বদলা দান করুন। আমীন।

বিনীত

মুহাম্মাদ আবদুল আলীম আনসারী

মহাপরিচালক, হুদহুদ প্রকাশন

ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা

পহেলা যিলহজ, ১৪৩৯ হি. (১৩/০৮/২০১৮ ইং)

লেখকের কথা

اَلْحَمْدُ للهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَالَاهُ

হামদ ও সালাতের পর!

প্রিয় পাঠক!

আপনার হাতের এ বইটি মূলত أَدْرِكْ أَهْلَكَ قَبْلَ أَنْ يَحْتَرِقُوْا 'আপনার পরিবারকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করুন' শিরোনামে মৌখিক একটি ভাষণের লেখ্যরূপ। এর সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে 'তোমাদের পরিবারের ব্যাপারে তোমরা আল্লাহ ﷻ-কে ভয় কর' শীর্ষক আলোচনার চুম্বক অংশ।

আর এটিকে পুস্তক আকারে রূপদান করেছে 'যাদ গ্রুপ' এর শিক্ষা বিভাগ।

–মুহাম্মাদ সালেহ আল মুনাজ্জিদ

ভূমিকা

إِنَّ الْحَمْدَ للهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

আল্লাহ ﷻ-র বাণী–

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾

হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে যেমন ভয় করা উচিত, ঠিক তেমনিভাবে ভয় করতে থাক এবং অবশ্যই মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না। [সূরা আলে ইমরান : ১০২]

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾

হে মানবসমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে তার সঙ্গিণীকে সৃষ্টি করেছেন; আর বিস্তার করেছেন তাদের দু'জন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী। আর আল্লাহকে ভয় কর, যার নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাঞ্চা করে থাক এবং আত্মীয়-জ্ঞাতিদের ব্যপারে সতর্কতা অবলম্বন কর। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে সচেতন রয়েছেন। [সূরা নিসা : ১]

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۙ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾

হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল। তিনি তোমাদের আমল-আচরণ সংশোধন করে দিবেন এবং তোমাদের

পাপসমূহ ক্ষমা করবেন। যে কেউ আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহা সাফল্য অর্জন করবে। [সূরা আহযাব : ৭০-৭১]

হামদ ও সালাতের পর!

আল্লাহ ﷻ আমাদেরকে যেসকল পার্থিব নেয়ামতদানে ধন্য করেছেন, তন্মধ্যে অন্যতম ও শ্রেষ্ঠতর হচ্ছে– পরিবার-পরিজন ও সন্তানাদির নেয়ামত। বলাবাহুল্য– যেকোনো নেয়ামতের ক্ষেত্রেই কর্তব্য হচ্ছে নেয়ামতদাতার কৃতজ্ঞতা ও শোকর আদায় করা। পাশাপাশি উক্ত নেয়ামতকে ঠিক সেভাবেই গ্রহণ ও ব্যবহার করা, যেভাবে নেয়ামতদাতা আদেশ করেছেন; যে পন্থা ও পদ্ধতি তিনি অনুমোদন করেছেন।

সে হিসেবে পরিবারের সদস্যদের সর্বদাই দ্বীনের দাওয়াত ও তালীম দিতে থাকা, উপকারী ও কল্যাণকর ইলম শিক্ষা দেওয়া, তাদের আচার-আচরণ ও চালচলন সংশোধন করা, আমলে সালেহ এর উপর অভ্যস্ত করে তোলা, যেসব বিষয় তাদের জন্য ক্ষতিকর সেসব বিষয়ে সতর্ক করা ও সেসব থেকে তাদেরকে বিরত রাখা– কৃতজ্ঞতা আদায়ের কার্যকরী মাধ্যমসূহের অন্যতম মাধ্যম; নেয়ামত হেফাজত ও সংরক্ষণের বিশেষ অবলম্বন। সর্বোপরি পরিবার-পরিজনের এ সম্পর্ক ও বন্ধন আখেরাত পর্যন্ত স্থায়ী করার ফলপ্রসূ আলম্বন।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ اتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِاِيْمَانٍ اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ

যারা ঈমানদার এবং যাদের সন্তানরা ঈমানে তাদের অনুগামী, আমি তাদেরকে তাদের পিতৃপুরুষদের সাথে মিলিত করে দেব। [সূরা তূর : ২১]

প্রিয় পাঠক!

বক্ষ্যমাণ এ পুস্তিকাটির আলোচনা গুরুত্বপূর্ণ এ বিষয়েই আবর্তিত। পাশাপাশি এতে স্থান পেয়েছে সেসকল উপকারী ও কল্যাণকর বিষয়,

যা একটি স্থায়ী, স্থিতিশীল ও সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত পরিবার গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ও অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।

একজন মানুষের পরিবারই তার মূল, শিকড় ও আসল। জীবন যাপনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। পরিবারই তার সহায়ক ও পৃষ্ঠপোষক। তার গোপন ভেদ ও রহস্য জান্তা। মানুষের মধ্যে পরিবারের সদস্যরাই তাকে সবচেয়ে বেশি ও ভালোভাবে চিনে-জানে। তার কল্যাণ ও মঙ্গল সাধনে তারাই অন্যদের তুলনায় একনিষ্ঠ ও অগ্রণী। কেন, আপনি কি দেখেন না, স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া-বিবাদ ও কলহ-বিরোধ সংক্রান্ত বিষয় সমাধানের জন্য আল্লাহ ﷻ পবিত্র কুরআনে কী ইরশাদ করেছেন–

﴿وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا ۚ اِنْ يُّرِيْدَآ اِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا ؕ﴾

যদি তাদের মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ হওয়ার মতো পরিস্থিতিরই আশঙ্কা কর, তবে স্বামীর পরিবার থেকে একজন এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন সালিস নিযুক্ত করবে। তারা উভয়ে মীমাংসা চাইলে আল্লাহ তাদের মধ্যে মীমাংসার অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করে দিবেন। [সূরা নিসা : ৩৫]

আর একজন মানুষের জন্য তার পরিবার-পরিজন, সন্তান-সন্ততি ও নিকটাত্মীয়দের ব্যাপারে যে কল্যাণটি সাধনের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি আগ্রহী ও মনোযোগী হওয়া উচিত, তা হচ্ছে– তাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করা। আল্লাহ ﷻ পবিত্র কুরআনে এ বিষয়েই আদেশ করেছেন এভাবে–

﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْۤا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَاۤ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ﴾

হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে সেই আগুন থেকে রক্ষা কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর, যাতে নিয়োজিত আছে পাষাণহৃদয় কঠোরস্বভাব

> ফেরেশেতাগণ। তারা আল্লাহ যা আদেশ করেন, তা অমান্য করে না এবং যা করতে আদেশ করা হয়, তা-ই করে। [সূরা তাহরীম : ৬]

প্রিয় পাঠক!

আল্লাহ ﷻ-র এ আদেশ পালনার্থে আমাদের এ গ্রন্থের আলোচনা আবর্তিত হবে পরিবার-পরিজন ও সন্তানাদিকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচানো প্রসঙ্গো; আমাদের ঘরসমূহ রক্ষার ব্যাপারে। যেন আমাদের ঘর ও পরিবার-পরিজন সে সকল বিষয়াশয় ও ক্রিয়াকর্ম থেকে মুক্ত থাকে, যা আল্লাহ ﷻ-র গযব ও ক্রোধ ডেকে আনে। আল্লাহ ﷻ আমাদের তাওফীক দান করুন। আমীন।

> ﴿رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَ ذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّ اجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا﴾
>
> হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের স্ত্রীদের পক্ষ থেকে এবং আমাদের সন্তানদের পক্ষ থেকে আমাদের জন্য চোখের শীতলতা দান করুন এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের জন্য আদর্শস্বরূপ করুন। [সূরা ফুরকান : ৭৪]

–মুহাম্মাদ সালেহ আল মুনাজ্জিদ

আলোচ্যবিষয়ের গুরুত্ব

পরিবার-পরিজনের দেখাশুনা ও তারবিয়াত প্রসঙ্গে আলোচনা করা নিঃসন্দেহে সুদৃঢ় একটি কেল্লা ও কেল্লার সকল প্রহরীকে রক্ষার আলোচনা। আর এক্ষেত্রে অবহেলা ও উদাসীনতার পরিচয় দেওয়া বড় ধরনের ফেতনা ও বিপর্যয় সৃষ্টির অবতারণা। প্রতিনিয়ত আমাদের সমাজে ঘটে যাওয়া ঘটনা ও দুর্ঘটনাই যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ ও বাস্তবতা।

এ বিষয়ে আলোচনা করা আল্লাহ ﷻ ও তাঁর রাসূল ﷺ-র আদেশেরই অনুসরণ ও বাস্তবায়ন। আল্লাহ ﷻ আমাদের ঈমানের ডাকে আহ্বান করেছেন, যেন আমরা আমাদের পরিবার-পরিজনের দেখাশুনা ও তারবিয়াত করি; তাদেরকে রক্ষণাবেক্ষণ ও জাহান্নামের আগুন থেকে হেফাজত করি। যেমন, তিনি ইরশাদ করেছেন–

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾

হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে সেই আগুন থেকে রক্ষা কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর, যাতে নিয়োজিত আছে পাষাণহৃদয় কঠোরস্বভাব ফেরেশেতাগণ। তারা আল্লাহ যা আদেশ করেন, তা অমান্য করে না এবং যা করতে আদেশ করা হয়, তা-ই করে। [সূরা তাহরীম : ৬]

কাতাদাহ رحمه الله বলেন, পরিবার-পরিজনকে আল্লাহ ﷻ-র আনুগত্যের আদেশ করবে, তাঁর অবাধ্যতা ও নাফরমানী থেকে নিষেধ করবে, তাদের উপর আল্লাহ ﷻ-র বিধান বাস্তবায়ন করবে, আল্লাহ ﷻ-র বিধান পালন ও বাস্তবায়নে তাদের সাহায্য করবে, খবরদারি করবে, তাদের থেকে কোনো অন্যায় ও অবাধ্যতা দেখলে নিষেধ করবে, তিরস্কার করবে এবং তা থেকে বিরত রাখবে।

এ বিষয়ে আলোচনা করা সৎ কাজের আদেশেরই নামান্তর। যেমন, আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেছেন–

﴿وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ ۪ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهٖ مَرْضِيًّا﴾

তিনি তাঁর পরিবারবর্গকে সালাত ও যাকাত আদায়ের নির্দেশ দিতেন এবং তিনি তাঁর পালনকর্তার কাছে পছন্দনীয় ছিলেন। [সূরা মারইয়াম : ৫৫]

পরিবারের দেখাশুনা, তদারকি ও তারবিয়াত করা বেশ জটিল ও অত্যন্ত ধৈর্যসাপেক্ষ ব্যাপার। সেখানে পাহাড়সম ধৈর্য ও অবিচলতা প্রয়োজন। যেমন, আল্লাহ ﷻ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন–

﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ؕ﴾

আপনি আপনার পরিবারের লোকদের সালাতের আদেশ দিন এবং তাতে অবিচল থাকুন। [সূরা ত্ব-হা : ১৩২]

এ বিষয়ে আলোচনা করা পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতা ও একে অপরের সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতা করার অন্তর্ভুক্ত। তা ছাড়া বিষয়টি আল্লাহ ﷻ-র নিম্নোক্ত বাণীর ব্যাপকতার আওতাভুক্তও, যেখানে তিনি ইরশাদ করেছেন–

﴿وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۪ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۪﴾

সৎকর্ম ও খোদাভীতিতে তোমরা একে অন্যের সাহায্য কর। পাপ ও সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারে একে অন্যের সহায়তা করো না। [সূরা মায়িদা : ২]

পরিবারের দেখাশুনা ও তদারকি করা একটি গুরুদায়িত্ব ও জবাবদিহিতার বিষয়; যা আল্লাহ ﷻ তাঁর বান্দাদের উপর আরোপ করেছেন। যেমন, আবদুল্লাহ ইবনে উমর رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, নবী কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন–

أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

জেনে রেখো! তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল; আর তোমরা প্রত্যেকেই নিজ অধীনস্তদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৫৫৪, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৮২৯]

আনাস رضي الله عنه থেকে বর্ণিত অপর এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন–

إِنَّ اللهَ سَائِلٌ كُلَّ رَاعٍ عَمَّا اسْتَرْعَاهُ أَحَفِظَ أَمْ ضَيَّعَ حَتَّى يَسْأَلَ الرَّجُلَ عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ.

নিশ্চয় আল্লাহ প্রত্যেক দায়িত্বশীলকে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন, যে ব্যাপারে তাকে দায়িত্বশীল করা হয়েছে; সে কি তা যথাযথভাবে পালন করেছে না অবহেলা করেছে! এমনকি পুরুষকে জিজ্ঞাসা করবেন তার পরিবার-পরিজন সম্পর্কে। [সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস নং ৪৫৭০]

প্রিয় পাঠক!

আমরা যদি আমাদের ডানে-বামে তাকাই, আশপাশের খবরাখবর ও সংবাদ সংগ্রহ করি, তা হলে দেখতে পাই, আমাদের সমাজে বহু দুঃখজনক ও মর্মান্তিক ঘটনা ঘটছে পারিবারিক বিভ্রান্তি, বিচ্যুতি ও ভ্রষ্টতার কারণে।

আমরা সকলেই জানি– পরিবারসমষ্টিকেই সমাজ বলে। সুতরাং, পরিবার ঠিক থাকলে সমাজ ঠিক থাকে; পরিবার ধ্বংস হয়ে গেলে সমাজ ধ্বংস হয়ে যায়; ধ্বংস হয়ে যেতে বাধ্য। আর তাই আমাদের জন্য আবশ্যক, পরিবার-পরিজনের তারবিয়াতের প্রতি সর্বোচ্চ

গুরুত্বারোপ করা, তাদেরকে দ্বীনী দাওয়াত ও তালীম দেওয়া এবং তাদেরকে সংশোধন করা। যেন তাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করা যায়। অতএব, ধ্বংস হয়ে যাওয়ার আগেই আপনি আপনার পরিবারের প্রতি মনোযোগী হোন; তাদেরকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করুন।

কার জন্য এ আলোচনা

প্রিয় পাঠক!

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের বিস্তারিত আলোচনা শুরু করার পূর্বেই আমরা বলে নিতে চাই– কারও জন্য উচিত হবে না পরিবারের দেখাশুনা ও তদারকির বিষয়টি কেবল পিতা বা স্বামীর মধ্যে সীমাবদ্ধ করে ফেলা; আর যুবকরা এই অজুহাত দেখিয়ে এ দায়িত্ব ও জবাবদিহিতা থেকে দূরে থাকা যে, তাদের ঘরে ও পরিবারে তাদের সংশোধনমূলক ভূমিকা খুবই দুর্বল, ক্ষীণ ও নগন্য। কিংবা এ কথা বলা যে, শরীয়ত তাদের উপর তাদের মা-বোনদের সংশোধনের দায়িত্ব আরোপ করেনি।

বরং এ বিষয়টি– অর্থাৎ পরিবারের দেখাশুনা, তদারকি ও সংশোধনের দায়িত্ব প্রত্যেক ওই ব্যক্তিকেই স্পর্শ করে, যার পরিবার আছে; চাই তিনি পিতা হোন কিংবা মাতা, স্বামী হোন কিংবা স্ত্রী, কিংবা হোন ভাই-ছেলে বা কোনো আত্মীয়-জ্ঞাতি।

আমাদের সামনে সেইসব যুবক সাহাবীর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ও নমুনা বিদ্যমান, যাঁরা নিজেদের পরিবারের ইসলাহ ও সংশোধনের দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে বহন করেছেন; যাঁরা নবীজী ﷺ-র হাতে তারবিয়াত পেয়েছেন। যেমন, আবু সুলাইমান মালেক ইবনে হুয়াইরিছ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

> أَتَيْنَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِيمًا رَفِيقًا فَلَمَّا ظَنَّ أَنَّا قَدْ اشْتَهَيْنَا أَهْلَنَا أَوْ قَدْ اشْتَقْنَا سَأَلَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا بَعْدَنَا فَأَخْبَرْنَاهُ قَالَ ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ فَأَقِيمُوا فِيهِمْ وَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ.
>
> আমরা সমবয়সী একদল যুবক নবী কারীম ﷺ-র কাছে হাজির হলাম। বিশ দিন ও বিশ রাত আমরা তাঁর কাছে অবস্থান করলাম। আল্লাহ ﷻ-র রাসূল ﷺ অত্যন্ত দয়ালু ও নম্র স্বভাবের মানুষ ছিলেন। তিনি যখন বুঝতে পারলেন, আমরা আমাদের পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরে যেতে চাই কিংবা ফিরে যাওয়ার জন্য আগ্রহী হয়ে পড়েছি, তখন তিনি আমাদের জিজ্ঞাসা করলেন, আমরা আমাদের পিছনে কাদের রেখে এসেছি? আমরা তাঁকে তা জানালাম। অতঃপর তিনি বললেন, তোমরা তোমাদের পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরে যাও এবং তাদের মাঝে বসবাস কর। আর তাদের [দ্বীন] শিক্ষা দাও এবং [সৎ কাজের] নির্দেশ দাও। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৩১, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৫৬৭]

বর্তমান যামানার যুবকদের উচিত– যুবক সাহাবীদের অনুসরণ করা; তাদের উপর আল্লাহ ﷻ যে দায়িত্ব ও জবাবদিহিতা আরোপ করেছেন, তা পরিপূর্ণরূপে উপলব্ধি করা ও তা যথাযথভাবে আদায় করা। অতএব, প্রতিটি যুবকেরই কর্তব্য– নিজ নিজ পরিবারে নিজের শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব ও অবস্থান তৈরি করা এবং এর মাধ্যমে পরিবারের সদস্যদের দ্বীনের পথে, আল্লাহ ﷻ-র পথে আহ্বানের দায়িত্ব পালন করা; প্রজ্ঞা ও হেকমতের সাথে যৌক্তিকভাবে পরিবারের ত্রুটি-বিচ্যুতি ও স্খলনগুলোকে সংশোধনের প্রতি মনোযোগী হওয়া।

মনে রাখবেন, বিনা প্রয়োজনে প্রথম ধাপেই শক্তি প্রয়োগ ও মারধরের দিকে যাবেন না। তবে যদি এ ছাড়া আর কোনো উপায় না থাকে, তা

হলে প্রয়োজন অনুপাতে বিচ্যুতির ধরন বুঝে শরয়ী নীতিমালা ও দিকনির্দেশনার আলোকে তা গ্রহণ করা যেতে পারে।

পরিবারকর্তা বলি আর যুবকদের কথাই বলি, তাদের উচিত– আপন পরিবারের অভ্যন্তরে প্রথমত বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য ধর্মীয় বই-পুস্তক, কিতাবাদি ও নানাবিধ উপদেশ সম্বলিত ইসলামী ক্যাসেট ইত্যাদির মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি ও সংশোধনের স্পৃহা সৃষ্টির চেষ্টা করা।

এ ক্ষেত্রে নারীরাও পুরুষদের মতোই। তাদেরও কর্তব্য– শরয়ী ইলম অর্জন করা এবং সে অনুযায়ী নিজের ঘর, সংসার, পরিবার-পরিজনকে ইসলাহ ও সংশোধনে আত্মনিয়োগ করা। কত নারীর হাতে তার স্বামী হেদায়েত পেয়েছে! কত বাবা তার মেয়ের উপদেশে তাওবা করে গুনাহের রাজ্য থেকে ফিরে এসেছে!

নারীদের অভিভাবক ও কর্তৃত্বশীলদের উচিত, এ ব্যাপারে তাদের সর্বাত্মক সহযোগিতা করা; ইলমী দরস ও মজলিসগুলোতে নারীদের অংশগ্রহণকে সহজ করে দেওয়া। তাদেরকে কুরআন শিক্ষা ও কুরআন হিফযের মাদরাসায় ভর্তি করিয়ে দেওয়া।

আল্লাহ ﷻ যাকেই হেদায়েতের দৌলত দানে সমৃদ্ধ করেছেন, তিনি যুবক হোন কিংবা বৃদ্ধ, পুরুষ হোন কিংবা নারী, প্রত্যেকেরই উচিত– নিজ নিজ পরিবারের অভ্যন্তরে ইতিবাচক ভূমিকা রাখা। পিতা-মাতা, ভাই-বোন ও অন্যান্য সদস্যদের উপর ইতিবাচক ও দ্বীনী প্রভাব বিস্তার করা। পরিবারের সদস্যদেরকে ভ্রষ্টতা, বিচ্যুতি ও স্খলনের পথ থেকে দূরে রাখার ফিকির করা। সর্বদাই এই ভাবনায় থাকা– কীভাবে তাদেরকে নেককার ও ভালো মানুষদের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া যায়!

মনে রাখবেন, আহূতের উপর আহ্বানকারীর কথার আছর তখনই পড়ে, যখন তার নিয়ত খাঁটি ও একনিষ্ঠ থাকে। একজন মানুষ যখন আন্তরিকভাবেই তার পরিবার-পরিজন ও ভাই-বোনদের কল্যাণ সাধনে ব্রতী হন, আল্লাহ ﷻ তখন তার জন্য কল্যাণের বিভিন্ন পথ খুলে

দেন। তাদের কাছে দ্বীনী দাওয়াত ও হক কথা পৌঁছানোর বিভিন্ন মাধ্যম ও পন্থা আবিষ্কার করে দেন।

একটু ভাবুন, আল্লাহ ﷻ-র নবী মুসা عَلَيْهِ السَّلَامُ আল্লাহ ﷻ-র দরবারে কী আবেদন জানিয়েছিলেন–

> وَاجْعَلْ لِّيْ وَزِيْرًا مِّنْ اَهْلِيْ ﴿٢٩﴾ هٰرُوْنَ اَخِي ﴿٣٠﴾ اشْدُدْ بِهٖۤ اَزْرِيْ ﴿٣١﴾ وَ اَشْرِكْهُ فِيْۤ اَمْرِيْ ﴿٣٢﴾
>
> আর আমার পরিবারবর্গের মধ্য থেকে আমার একজন সাহায্যকারী করে দিন; আমার ভাই হারূনকে। তার মাধ্যমে আমার কোমর মজবুত করুন। [আমার শক্তি সুদৃঢ় করুন] এবং তাকে আমার কাজে অংশীদার করুন। [সূরা ত্ব-হা : ২৯-৩২]

এখানে তিনি তাঁর ভাইয়ের জন্য কল্যাণ কামনা করেছেন। তাঁর সঙ্গো তাঁর কাজে অংশীদারিত্ব চেয়েছেন। যেন আল্লাহ ﷻ-র আনুগত্য ও তাঁর দাওয়াতে সাহায্য করতে পারেন।

অতএব, প্রিয় পাঠক! আপনার নিয়ত শুদ্ধ করে নিন। একনিষ্ঠ হোন। আল্লাহ ﷻ-র দরবারে সাহায্য প্রর্থানা করুন এবং আমাদের সাথে থেকে এ গ্রন্থের সামনের পৃষ্ঠাগুলোতে মনোযোগ দিন। হতে পারে আপনার হাতে আল্লাহ ﷻ আপনার পরিবার-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়দের জাহান্নামের আযাব থেকে নাজাতের ফায়সালা লিখে দিবেন।

আল্লাহ ﷻ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন–

> ﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْۤا اَنْفُسَكُمْ وَ اَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّ قُوْدُهَا النَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَاۤ اَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ﴾
>
> হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে সেই আগুন থেকে রক্ষা কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর, যাতে নিয়োজিত আছে পাষাণহৃদয় কঠোরস্বভাব ফেরেশতাগণ। তারা আল্লাহ যা আদেশ করেন, তা অমান্য করে না এবং যা করতে আদেশ করা হয়, তা-ই করে। [সূরা তাহরীম : ৬]

পরিবারকে জাহান্নাম থেকে রক্ষার উপায়

পরিবার-পরিজনের তারবিয়াত করা এবং তাদের প্রতি মনোযোগী থাকা নিঃসন্দেহে আল্লাহ ﷻ-র নিম্নোক্ত আদেশেরই বাস্তবায়ন, যেখানে তিনি ইরশাদ করেছেন–

قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا

তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে [জাহান্নামের] আগুন থেকে রক্ষা কর। [সূরা তাহরীম : ৬]

এটা আম্বিয়ায়ে কেরাম عليهم السلام-র আনুগত্য ও অনুসরণ, যাঁদের অনুসরণের ব্যাপারে আল্লাহ ﷻ আমাদের আদেশ করেছেন। যেমন, তিনি ইরশাদ করেছেন–

فَبِهُدٰىهُمُ اقْتَدِهْ ؕ

অতএব, আপনিও তাদের পথ অনুসরণ করুন। [আনআম : ৯০]

আপন আপন পরিবারের ব্যাপারে আম্বিয়ায়ে কেরাম عليهم السلام-র আন্তরিকতা, গুরুত্ব ও মনোযোগের চিত্র আল্লাহ ﷻ পবিত্র কুরআনের স্থানে স্থানে তুলে ধরেছেন। যেমন, তিনি ইসমাঈল عليه السلام-র ব্যাপারে ইরশাদ করেছেন–

﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ اِسْمٰعِيْلَ ۫ اِنَّهٗ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُوْلًا نَّبِيًّا ۚ وَكَانَ يَاْمُرُ اَهْلَهٗ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ ۪ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهٖ مَرْضِيًّا﴾

এই কিতাবে ইসমাঈলের কথা বর্ণনা করুন, তিনি প্রতিশ্রুতি পালনে সত্যাশ্রয়ী এবং তিনি ছিলেন রাসূল, নবী। তিনি তাঁর পরিবারবর্গকে সালাত ও যাকাত আদায়ের নির্দেশ দিতেন এবং তিনি তাঁর পালনকর্তার কাছে পছন্দনীয় ছিলেন। [সূরা মারইয়াম : ৫৪-৫৫]

অতএব, একজন মুসলিমের জন্য সর্বপ্রথম কর্তব্য ও আবশ্যক হচ্ছে– নিজ ঘরকে, পরিবার-পরিজনকে আল্লাহ ﷻ-র ভয় ও তাকওয়া-ত্বহারাতের উপর প্রতিষ্ঠিত করা; আপন ঘরকে আক্ষরিক অর্থেই একটি মুসলিম ঘর হিসেবে রূপান্তরিত করা। পরিবার-পরিজনকে আল্লাহ ﷻ-র ফরয বিধান ও করণীয় পালনে মনোযোগী করে তোলা। যা তাদেরকে আল্লাহ ﷻ পর্যন্ত পৌঁছে দিবে এবং জান্নাতের হকদার বানিয়ে দিবে।

একজন মুমিন তার পরিবার-পরিজনের হেদায়েত ও ঘর সংশোধনের ব্যাপারে দায়বদ্ধ, যেমন সে দায়বদ্ধ তার নিজের নফসের হেদায়েত ও কলবের সংশোধনের ব্যাপারে। কারণ, নবী কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন–

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ.

তোমরা প্রত্যেকেই রক্ষক এবং তোমরা প্রত্যেকেই জিজ্ঞাসিত হবে। শাসক তার অধীনস্তদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। পুরুষ তার পরিবারের রক্ষক; সে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। স্ত্রী তার স্বামীর গৃহের রক্ষক; সে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। গোলাম তার মনিবের সম্পদের রক্ষক; সে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। অতএব সাবধান! তোমরা প্রত্যেকেই রক্ষক এবং তোমরা প্রত্যেকেই জিজ্ঞাসিত হবে। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫১৮৮, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৮২৯]

নবীজী ﷺ-র এ হাদীস একজন মুসলিমের দায়-দায়িত্ব ও কর্তব্য সকলের সামনে একেবারেই স্পষ্ট করে দিচ্ছে; যে দায়িত্ব ব্যাপক, সর্বব্যাপী; যেখানে কেউই ব্যতিক্রম নয়, দায়িত্বের আওতাবহির্ভূত নয়।

একজন মুমিনের নিজের নফসের দায়িত্ব ও পরিবার-পরিজনের দায়িত্ব নিঃসন্দেহে অনেক কঠিন ও ভারী দায়িত্ব। জাহান্নামকে সৃষ্টি করা হয়েছে জালিমদের জন্য; অনাচারীদের জন্য। মুমিন ও তার পরিবার প্রতিনিয়তই এ জাহান্নামের সম্মুখীন হয়; মুখোমুখি হয়। মুমিনের দায়িত্ব– এ জাহান্নাম থেকে, জাহান্নামের আগুন থেকে নিজেকে এবং নিজের পরিবার-পরিজনকে বাঁচানো।

তাই আমাদের পরিবারকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করার জন্য আমাদের অনেক কিছুই করা কর্তব্য– করতে হবে। তার মধ্যে কয়েকটি নিম্নোরূপ–

১. কোরআন ও দ্বীনের জরুরি বিষয় শিক্ষাদান

শরয়ী ইলম নিঃসন্দেহে আল্লাহ ﷻ-কে ভয় করার মাধ্যম। যেমন, আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেছেন–

﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَٰٓؤُا﴾

আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে আলেমরাই কেবল তাঁকে ভয় করে। [সূরা ফাতির : ২৮]

অতএব, একজন গৃহকর্তা যখন আপন পরিবারকে আল্লাহ ﷻ-র কিতাব এবং তাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ শরয়ী ইলম শিক্ষাদানের প্রতি গুরুত্বারোপ করবেন, তখন তিনি তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বাঁচানোর প্রথম ধাপে উত্তীর্ণ করে দিলেন।

ইসলামী শরীয়ত নারীদেরকেও ইলমে দ্বীন ও আদব শিক্ষাদানের ব্যাপারে উৎসাহ দিয়েছে। ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ তাঁর সহীহ বুখারীতে একটি অধ্যায়ই কায়েম করেছেন 'নিজের দাসী ও পরিবার-পরিজনকে

শিক্ষাদান' নামে। সে অধ্যায়ের অধীনে তিনি আবু মুসা আশআরী ﵁ থেকে বর্ণিত একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন, যেখানে নবীজী ﷺ ইরশাদ করেছেন–

ثَلَاثَةٌ لَهُمْ أَجْرَانِ ... وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ.

তিন ধরনের লোকের জন্য দু'টি সাওয়াব রয়েছে ... [তাদের মধ্যে একজন] ওই ব্যক্তি, যার একটি বাঁদি ছিল, যার সাথে সে মিলিত হত। তারপর তাকে সে সুন্দরভাবে আদব-কায়দা শিক্ষা দিয়েছে এবং ভালোভাবে দ্বীনী ইলম শিক্ষা দিয়েছে। এরপর তাকে আযাদ করে বিয়ে করেছে। তার জন্য দু'টি সাওয়াব রয়েছে। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৯৭, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৫৪]

ইবনে হাজার আসকালানী ﵀ বলেন, বাঁদি প্রসঙ্গে 'তরজমাতুল বাব' এর সাথে হাদীসের সামঞ্জস্য 'নস' দ্বারা প্রমাণিত আর পরিবারের ব্যাপারে সামঞ্জস্য 'কিয়াস' দ্বারা প্রমাণিত। কেননা, পরিবারের স্বাধীন সদস্যদের আল্লাহ ﷻ-র ফরয বিধানাবলি ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-র সুন্নাতসমূহ শিক্ষাদান করার প্রতি যত্নশীল হওয়া বাঁদিকে এসব বিষয় শিক্ষাদানের প্রতি মনোযোগী হওয়ার তুলনায় অধিক গুরুত্বপূর্ণ। [ফাতহুল বারী : ১/১৯০]

ইমাম যাহহাক ও মুকাতিল ﵀ বলেন, একজন মুসলিমের দায়িত্ব ও কর্তব্য– তার পরিবার-পরিজন, নিকটাত্মীয় ও গোলাম-বাঁদিসহ সকলকে সেসব বিষয়ে শিক্ষাদান করা, যা আল্লাহ ﷻ তাদের উপর ফরয করেছেন এবং যা থেকে নিষেধ করেছেন। [তাফসীরে ইবনে কাসীর : ৪/৫০২]

অতএব, আমাদের উপর আবশ্যক– আমাদের সন্তান-সন্ততি ও পরিবারবর্গকে দ্বীন ও প্রয়োজনীয় আদব শিক্ষাদান করা।

শরীয়ত নারীদেরকে স্বতন্ত্রভাবে শিক্ষাদানের অধিকার নিশ্চিত করেছে। যেমন, ইমাম বুখারী রহ. তাঁর সহীহ বুখারীতে একটি অধ্যায় কায়েম

করেছেন 'নারীদের জ্ঞান লাভের জন্য আলাদাভাবে দিন নির্ধারণ করা যায় কি?' নামে। অতঃপর সেখানে তিনি আবু সাঈদ খুদরী ﵁-র সূত্রে এই হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন–

قَالَتْ النِّسَاءُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَلَبَنَا عَلَيْكَ الرِّجَالُ فَاجْعَلْ لَنَا يَوْمًا مِنْ نَفْسِكَ فَوَعَدَهُنَّ يَوْمًا لَقِيَهُنَّ فِيهِ فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ.

একদিন নারীরা নবী কারীম ﷺ-কে বলল, পুরুষরা আপনার কাছে আমাদের চেয়ে প্রাধান্য বিস্তার করে আছে। তাই আপনি আপনার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য একটি দিন নির্ধারণ করে দিন। তিনি তাঁদের বিশেষ একটি দিনের অঙ্গীকার করলেন। সে দিন তিনি তাঁদের কাছে গেলেন এবং তাঁদের উপদেশ ও নির্দেশ দিলেন। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১০২, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৬৩৪]

তদ্রূপ সুহাইল ইবনে আবি সালেহ তাঁর পিতার সূত্রে হযরত আবু হুরায়রা ﵁-র বরাতে যে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, তাতেও এর মতো ঘটনাই বর্ণিত হয়েছে। সেখানে নবীজী ﷺ বলেছেন, 'তোমাদের জন্য প্রতিশ্রুত স্থান হচ্ছে অমুকের ঘর। অতঃপর তিনি তাঁদের কাছে আগমন করেছেন এবং তাঁদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন [উপদেশ-নসীহত করেছেন]। [আস-সুনানুল কুবরা লিন নাসায়ী : ৩/৪৫২, সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস নং ৩০০৩, মুসনাদুল হুমাইদী, হাদীস নং ১০৬৭]

এ হাদীসে দেখা যাচ্ছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিশেষভাবে নারীদের জন্য নির্দিষ্ট দিন-ক্ষণ ও স্থান নির্ধারণ করেছেন।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﵄ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ.

আমি নবীজী ﷺ-র সাথে ঈদুল ফিতর বা ঈদুল আযহার দিন বের হলাম। তিনি সালাত আদায় করলেন। অতঃপর খুতবা

দিলেন। তারপর নারীদের কাছে গিয়ে তাঁদেরকে নসীহত করলেন এবং তাঁদেরকে দান-সদকার নির্দেশ দিলেন। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৯৩২, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৮৮৪]

ইবনে হাজার আসকালানী رحمه الله বলেন, এই হাদীসের ফায়দাসমূহের একটি হচ্ছে– নারীদেরকে ওয়াজ-নসীহত করা, উপদেশ দেওয়া, ইসলামের হুকুম-আহকাম শিক্ষা দেওয়া, তাঁদের উপর অর্পিত দায়িত্ব ও যিম্মাদারির কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া, তাঁদেরকে সদকার ব্যাপারে উৎসাহিত করা এবং তাঁদের জন্য বিশেষভাবে আলাদা মজলিসের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি সবই মুস্তাহাব; তবে শর্ত হচ্ছে তাঁরা নিজেরা ও তাঁদের মজলিস সমস্ত রকমের ফেতনা-ফাসাদ ও অন্যায় থেকে নিরাপদ থাকতে হবে। [ফাতহুল বারী : ৩/৪০৭]

অপরদিকে পুরুষদের উচিত উদারচিত্ত হওয়া। নারীদের বিভিন্ন প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসাকে প্রফুল্লতার সাথে গ্রহণ করা এবং তাদের কাছে শরীয়তের বিশুদ্ধ জ্ঞান যথাযথরূপে পৌঁছে দেওয়া।

ইবনে আবি মুলাইকা থেকে বর্ণিত–

أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ لَا تَسْمَعُ شَيْئًا لَا تَعْرِفُهُ إِلَّا رَاجَعَتْ فِيهِ حَتَّى تَعْرِفَهُ وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حُوسِبَ عُذِّبَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ أَوَلَيْسَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا قَالَتْ فَقَالَ إِنَّمَا ذَلِكِ الْعَرْضُ وَلَكِنْ مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ يَهْلِكْ.

নবী কারীম ﷺ-র স্ত্রী আয়েশা رضي الله عنها কোনো কথা শুনে না বুঝলে বার বার প্রশ্ন করে তা বুঝে নিতেন। [একদিন] নবী কারীম ﷺ ইরশাদ করলেন '[কেয়ামতের দিন] যার কাছ থেকে হিসাব চাওয়া হবে, তাকে শাস্তি দেওয়া হবে।' আয়েশা رضي الله عنها বলেন, [এ কথা শুনে] আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আল্লাহ ﷻ কি [পবিত্র কুরআনে এই] ইরশাদ করেননি 'তার হিসাব-নিকাশ

সহজে হয়ে যাবে। [সূরা ইনশিক্বাক : ৮] আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, তখন তিনি [নবীজী ﷺ] বললেন, তা কেবল হিসাব প্রকাশ করা। কিন্তু যার হিসাব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নেওয়া হবে, সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১০৩, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৮৭৬]

কেয়ামতের দিন কিছু কিছু মানুষের হিসাব নেওয়া হবে খুব সহজভাবে। তাদেরকে কোনো জেরা-জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না। তাদের আমল-আখলাক ও সগীরা-কবীরা গুনাহ সম্পর্কে তেমন কোনো জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না।

অতঃপর খুব দ্রুতই তাদের হিসাব-নিকাশ শেষ হয়ে যাবে। তারপর তারা জান্নাতে চলে যাবে। আর যাদেরকে তাদের আমল সম্পর্কে জেরা-জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, যাবতীয় আমল সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে, সগীরা-কবীরা সব বিষয়েই জেরা করা হবে, তারা সুনিশ্চিত ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।

– আমরা আল্লাহ ﷻ-র দরবারে নিরাপত্তা ও পানাহ চাই।

প্রিয় পাঠক!

এই যে আয়েশা رضي الله عنها, তিনি একজন নারী হওয়া সত্ত্বেও– যে বিষয়ে তাঁর খটকা লেগেছে, সে বিষয়ে সঠিক তথ্যলাভ ও তৃপ্ত হওয়ার জন্য তাঁর স্বামী [নবীজী ﷺ]-কে জিজ্ঞাসা করেছেন। আর নবীজী ﷺও অত্যন্ত সুন্দরভাবে তাঁর প্রশ্নের জওয়াব দিয়েছেন।

–কেন যে আমাদের নারীরা তাদের দ্বীনী বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসার ব্যাপারে আয়েশা رضي الله عنها-র অনুসরণ করে না?! আর কেনই যে আমাদের পুরুষরা তাদের নারীদের দ্বীন শিক্ষাদানের ব্যাপারে নবীজী ﷺ-র অনুকরণ করে না?!

আমাদের সকলেরই জেনে রাখা উচিত– পুরুষের অবহেলা উদাসীনতা ও ত্রুটির কারণে যে মূর্খতা তার স্ত্রী-কন্যা ও বোনদের সঙ্গে যুক্ত হয়,

তার দায় ওই পুরুষের কবর পর্যন্ত যায়। যেমন, আবদুল্লাহ ইবনে উমর ﷺ থেকে বর্ণিত–

أَنَّ حَفْصَةَ بَكَتْ عَلَى عُمَرَ فَقَالَ مَهْلاً يَا بُنَيَّةُ أَلَمْ تَعْلَمِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ.

উমর ﷺ [ঘাতক কর্তৃক আহত হলে] হাফসা ﷺ কাঁদছিলেন। তখন উমর ﷺ বললেন, থামো হে স্নেহের কন্যা! তুমি কি জান না, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, মৃত ব্যক্তিকে তার স্বজনদের কান্নাকাটির কারণে শাস্তি দেওয়া হয়। [বুখারী, হাদীস নং ১২৮৮, মুসলিম, হাদীস নং ৯২৭]

এ হাদীসের ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের বিভিন্ন অভিমত রয়েছে। তার মধ্যে শক্তিশালী অভিমত হচ্ছে– ব্যক্তিকে তার কবরে [তার পরিবার-পরিজনের কান্নাকাটির কারণে] শাস্তি দেওয়া হবে– যদি সে জানত যে, বিলাপ করে কান্নাকাটি করা তার পরিবারের অভ্যাস এবং তা জানা সত্ত্বেও সে তাদেরকে বিলাপ করা হারাম হওয়ার ব্যাপারে তালীম দেয়নি এবং তার মৃত্যুর পূর্বে তাদেরকে নিষেধ করেনি। তা হলে সেক্ষেত্রে সে মারা যাওয়ার পর তাকে নিয়ে বিলাপ করে কান্নাকাটি করলে সে কারণে তাকে তার কবরে আযাব ভোগ করতে হবে।

– বর্ণিত হাদীসের এ ব্যাখ্যাটিই সর্বাধিক উৎকৃষ্ট।

এ ব্যাখ্যাটি গ্রহণ করলেই বর্ণিত হাদীসের মর্ম ও আল্লাহ ﷻ-র নিম্নোক্ত বাণীর মাঝে কোনো বিরোধ থাকে না, যেখানে তিনি ইরশাদ করেছেন–

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ أُخْرَىٰ

কেউ অপরের বোঝা বহন করবে না। [সূরা আনআম : ১৬৪]

[টীকা– ইমাম বুখারী ﷺ তাঁর সহীহ বুখারীতে একটি অধ্যায় কায়েম করেছেন এ নামে– অধ্যায় : নবী ﷺ-র বাণী– পরিবার-পরিজনের কান্নার কারণে মৃত ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়া হয়, যদি বিলাপ করা তার

অভ্যাস হয়ে থাকে। কারণ, আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেছেন, তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর। [সূরা তাহরীম : ৬] এবং নবী কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই তার নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।

তবে তা যদি তার অভ্যাস না হয়ে থাকে, তা হলে তার বিধান হবে তেমন, যেমনটা হযরত আয়েশা رضي الله عنها বলেছেন– [অনুবাদ] ‘কেউ অপরের বোঝা বহন করবে না। [সূরা আনআম : ১৬৪] আর এ হল আল্লাহ ﷻ-র এ বাণীর ন্যায়– [অনুবাদ] ‘কোনো [গুনাহের] বোঝা বহনকারী ব্যক্তি যদি অন্য কাউকে তা বহন করতে আহ্বান করে, তা হলে তা থেকে কিছুই বহন করা হবে না। [সূরা ফাতির : ১৮] তবে বিলাপ ব্যতীত শুধু ক্রন্দনের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। নবী কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা হলে সে হত্যার অপরাধের অংশ প্রথম আদম সন্তান [কাবিল] এর উপর বর্তাবে। আর সেটা এ কারণে যে, সে-ই প্রথম ব্যক্তি, যে হত্যার প্রবর্তন করেছে।]

একজন পুরুষের জন্য আবশ্যক– তার পরিবার-পরিজন যেসকল হুকুম-আহকাম জানার প্রতি মুখাপেক্ষী, তিনি যদি সেগুলো না জানেন, তা হলে তিনি সেগুলো বিজ্ঞ কারও কাছে জিজ্ঞাসা করে জেনে নেবেন।

আমাদের অনেক আনন্দ হয়, যখন আমরা পুরুষদের ব্যাপারে জানতে পারি– তারা কোনো আলেমের কাছে এসে তাদের নারীদের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের হুকুম-আহকাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছেন। যেমন, তাদের প্রতি মাসের ত্বহারত-পবিত্রতা সম্পর্কে, তাদের মাহরামের হুকুম-আহকাম সম্পর্কে, কাদের সাথে তাদের পর্দা করতে হবে আর কাদের সাথে পর্দা করতে হবে না ইত্যাদি প্রসঙ্গে।

একজন পুরুষের এমনটা করা এ কথার প্রমাণ বহন করে– তিনি তার পরিবার-পরিজনের ব্যাপারে এবং আল্লাহ ﷻ-র নিম্নোক্ত আদেশ বাস্তবায়নের ব্যাপারে যত্নশীল। আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেছেন–

قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ.

> মুমিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে সেই আগুন থেকে রক্ষা কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর। [সূরা তাহরীম : ৬]

এতে প্রমাণিত হয়– কার্যতই তিনি তার দায়িত্ব ও দায়বদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন এবং তিনি তা অন্তর দিয়ে গুরুত্বসহকারে উপলব্ধিও করেন। তাই তো তিনি তার স্ত্রী-পরিজন ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সাথে সংশ্লিষ্ট হুকুম-আহকাম সম্পর্কে জানতে চান, জিজ্ঞাসা করেন।

প্রিয় পাঠক!

এ পরিচ্ছেদের সমাপ্তিতে এসে আমাদের পরামর্শ ও প্রস্তাব–

* কুরআনের ব্যাপারে : পরিবারের সদস্যদের এতটুকু পরিমাণ কুরআন হিফয করাবেন, যা দিয়ে তাদের সালাত আদায় শুদ্ধ হয়। পাশাপাশি তারা যেন নিজেদের জীবনে আমল করার জন্য কুরআন নিয়ে চিন্তা-ফিকির ও গবেষণা করার মতো পুঁজি পায়। যেমন, আমপারা, সূরা মুলক, সূরা কাহফ, সূরা নূর, সূরা হুজুরাত ইত্যাদি হিফয করানো এবং সাথে সাথে এর তাফসীরও শিক্ষা দেওয়া।

এক তালিবুল ইলম তার শায়খকে –শায়খ সফরে বের হওয়ার প্রাক্কালে– জিজ্ঞাসা করেছিল– মুহতারাম শায়খ! আপনি আমাকে কী উপদেশ দিয়ে যাচ্ছেন?

শায়খ জওয়াবে বললেন, আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি আল্লাহ ﷻ-র কিতাবের ব্যাপারে। এ কিতাব তুমি তেলাওয়াত করবে, এ কিতাব নিয়ে গবেষণা করবে, এ কিতাব হিফয করবে এবং এর তাফসীরের জ্ঞান লাভ করবে।

প্রিয় পাঠক!

মুহতারাম শায়খের এ উপদেশটি একটি বহুমুখী ও সর্বব্যাপী উপদেশ। আমাদের পরিবার-পরিজনকে তারবিয়াত করার জন্য এমন একটি

উপদেশের প্রতিই আমরা মুখাপেক্ষী। অতএব, আমাদের জন্য উচিত, তাদের মাঝে আল্লাহ ﷻ-র কালাম বাস্তবায়ন করা, তাদের অন্তরে আল্লাহ ﷻ-র কিতাবের প্রতি ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-র সুন্নাতের প্রতি গুরুত্ব ও যত্নবোধ জাগ্রত করা। যেমনটা আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেছেন–

وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ

> আল্লাহর আয়াত ও হিকমত, যা তোমাদের গৃহে পঠিত হয় তোমরা সেগুলো স্মরণ করবে। [সূরা আহযাব : ৩৪]

– আর সুন্নাতই হচ্ছে হিকমত।

* হাদীসের ব্যাপারে : ইমাম নববী রহ. এর 'আল আরবাউন' ব্যাখ্যা করে তাদের শোনাবেন, পড়াবেন, পড়তে দিবেন। পাশাপাশি তা মুখস্থ করে নিতেও উৎসাহ দিবেন।

* আকীদার ব্যাপারে : আকীদা সংক্রান্ত যেকোনো সহজ একটি কিতাব পড়তে দিবেন বা পড়াবেন। যেমন, 'আকীদা সংক্রান্ত ২০০ প্রশ্নোত্তর'।

* ফিকহের ব্যাপারে : ফিকহের ক্ষেত্রে তাদেরকে নবীজীর অযু ও সালাত, পাশাপাশি তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ মাসআলাসমূহও শিক্ষা দিবেন। যেমন, পর্দা, অলংকার ও সৌন্দর্যগ্রহণ, সাজ-সজ্জা ও হায়েয-নেফাসের হুকুম-আহকাম ইত্যাদি।

* সীরাতের ব্যাপারে : এ ব্যাপারেও কোনো ধরনের অবহেলা বা উদাসীনতা করা যাবে না। বিশেষত ছোট বাচ্চাদের ক্ষেত্রে।

* ওয়াজ-নসীহত ও উপদেশের ব্যাপারে : আমাদের দরস ও পাঠদান পদ্ধতিতে এ বিষয়টির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা জরুরি। আমাদের দরসগুলো যেন কেবলই এমনসব ইলম ও বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকে, যেখানে কেবল পড়ানো হবে– আমাদের মত এটি, অমুকের অভিমত সেটি ইত্যাদি আর সেখানে দয়াময় আল্লাহ ﷻ-র যিকিরের কথা থাকবে না।

বহু মানুষকে তার কঠিন ইলম তার অন্তরের রোগ নির্ণয় ও তা প্রতিকারের প্রতি মনোনিবেশ করা থেকে বিরত রেখেছে; বিমুখ করে রেখেছে, ভুলিয়ে রেখেছে। অথচ মানুষের অন্তরে মরিচা পড়ে; আর সে মরিচা দূর করা ও পরিষ্কার করার মাধ্যম হচ্ছে আল্লাহ ﷻ-র যিকির।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে– আমাদের পরিবারকে তালীম ও শিক্ষাদানের এ ধারা যেন ধারাবাহিক হয়; অব্যাহতভাবে চলতে থাকে। তা যেন খণ্ড খণ্ড ও বিচ্ছিন্নভাবে না হয়। প্রয়োজনে পরিবারের সকলের জন্য প্রতি সপ্তাহে একটি দিন নির্ধারণ করে নেওয়া হবে, যে দিনের মজলিসে সকলেরই বাধ্যতামূলকভাবে উপস্থিত থাকতে হবে; কোনো অবস্থাতেই তাতে অনুপস্থিত থাকা যাবে না। এ তালীম ও দরসদান আজীবন চলবে; কোনো বিরতি বা অবসর দেওয়া যাবে না।

২. ফরয আদায়ে বাধ্য ও অভ্যস্থ করা

ফরয বিধান আদায়ের ব্যাপারে পরিবারকর্তার যত্নবান হওয়া এবং তা আদায়ে স্ত্রী-পরিজন ও সন্তানাদির তদারকি করা জরুরি। বিশেষত সালাতের ব্যাপারে। অতএব, তাদেরকে বাধ্য করতে হবে যাবতীয় রুকন-আরকান, শর্ত-ওয়াজিব ও সুন্নাত-মুস্তাহাবসহ ওয়াক্তমতো সালাত আদায়ের ব্যাপারে। বিশেষভাবে ফজরের সালাতে।

আমি একবার শায়খ আবদুল আযীয বিন বায রহিমাহুল্লাহ-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম– এক ব্যক্তি ফজরের সালাতের জন্য ঘর থেকে বের হয়েছেন। সালাতের পর তিনি মসজিদে দরসে উপস্থিত হবেন। এমতাবস্থায় তার পরিবার-পরিজন ঘুমিয়ে আছে। এখন তার করণীয় কী? তার জন্য কি ঘরে ফিরে গিয়ে পরিবার-পরিজনকে ঘুম থেকে জাগানো জরুরি, যদিও তার দরসের কিছু অংশ এমনকি পুরো দরসই ছুটে যায়? না তিনি দরসে উপস্থিত হবেন?

শায়খ উত্তরে বলেছেন, না; বরং তার জন্য ফিরে যাওয়া ওয়াজিব। কেননা, পরিবার-পরিজনকে সালাতের আদেশ করা ওয়াজিব। আর দরসে উপস্থিত হওয়া মুস্তাহাব। মুস্তাহাবকে কখনোই ওয়াজিবের উপর প্রাধান্য দেওয়া যাবে না।

অথচ পরিবার-পরিজন ও সন্তানাদিকে সালাতের আদেশদান ও গুরুত্ব প্রদানের ব্যাপারে আমাদের ভূমিকা ও বাস্তবতা খুবই দুঃখজনক, বেদনাদায়ক। এক্ষেত্রে আমাদের অবহেলা ও ত্রুটি সীমাহীন, অমার্জনীয়।

ওহে মুসলিম ভাই! ওহে পরিবারকর্তা ও দায়িত্বশীল ভাই! আপনি কি জানেন আপনার সন্তান সালাত আদায় শেখে কীভাবে? আজ আমাদের সন্তানরা একে অপর থেকে সালাত আদায় শেখে। তাদের প্রত্যেকেই অপরের দিকে তাকায়– সে কীভাবে সালাত আদায় করে?

এভাবে দেখে দেখে সে-ও এমনভাবে সালাত আদায় শেখে, যে সালাতে কোনো খুশুখুযু থাকে না; যেখানে সুন্নাতের কোনো গুরুত্ব থাকে না। কেন আমাদের সন্তানরা তাদের পিতার কাছ থেকে সালাত আদায় শেখে না? কেন তাদের অভিভাবকদের থেকে শিখতে পারে না? আমাদের দায়িত্ব, আমাদের কতর্ব্য– সালাত আদায়ের ব্যাপারে পরিবার-পরিজনের যথাযথ তদারকি করা; তাদের খোঁজ-খবর নেওয়া।

পরিবারের আরও যেসকল বিষয়ে আমাদের খোঁজ-খবর নেওয়া ও তদারকি করা জরুরি, তার একটি হচ্ছে– যাকাত আদায় করা। যদি পরিবারের কারও কাছে সম্পদ থাকে, অলংকার থাকে কিংবা ব্যবসায়িক পণ্য থাকে, যার উপর যাকাত ফরয হয়, তা হলে আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য– তাকে যাকাত আদায় করতে আদেশ করা। পবিত্র কুরআনে হযরত ইসমাঈল عليه السلام-র ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে, তিনি তাঁর পরিবারকে সালাত ও যাকাতের ব্যাপারে আদেশ করতেন। যেমন–

﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ اِسْمٰعِيْلَ اِنَّهٗ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُوْلًا نَّبِيًّا . وَكَانَ يَاْمُرُ اَهْلَهٗ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهٖ مَرْضِيًّا﴾

> এই কিতাবে ইসমাঈলের কথা বর্ণনা করুন, তিনি প্রতিশ্রুতি পালনে সত্যাশ্রয়ী এবং তিনি ছিলেন রাসূল, নবী। তিনি তাঁর পরিবারবর্গকে সালাত ও যাকাত আদায়ের নির্দেশ দিতেন এবং তিনি তাঁর পালনকর্তার কাছে পছন্দনীয় ছিলেন। [সূরা মারইয়াম : ৫৪-৫৫]

পরিবারকর্তার আরও দায়িত্ব হচ্ছে, তার অধীনস্ত সদস্যদের রোযার ব্যাপারেও তদারকি করা, খোঁজ-খবর রাখা। কোনো কারণে তাদের রমযানের কোনো রোযা ছুটে গিয়ে থাকলে সেগুলো কাযা করে নেওয়ার ব্যাপারে সহযোগিতা করা। প্রয়োজনে তিনিও তাদের সাথে [নফল] রোযা রাখবেন। এভাবে তাদের রোযাগুলো দ্রুত কাযা করে নেওয়ার ব্যাপারে উৎসাহিত করবেন।

আমাদের আরও কর্তব্য হচ্ছে, নারীদের জন্য হজ-উমরা আদায়কে সহজ করে দেওয়া। প্রয়োজনে তাদের সাথে সফর করা। যাতে তারা এই মহান দুই ইবাদত [হজ ও উমরা] আদায় করতে পারে। কারণ, মহিলাদের সফরের জন্য সঙ্গে মাহরাম থাকা আবশ্যক।

কোনো নারীর উপর হজ ফরয হলে তিনি যদি হজ আদায়ে উদ্যোগী হন এবং তার সাথে মাহরামও থাকে, তা হলে স্বামীর কর্তব্য তাকে বাধা না দেওয়া; স্ত্রীর পথে প্রতিবন্ধক না হওয়া।

—এক্ষেত্রে স্বামীর জন্য স্ত্রীকে ফরয হজ আদায়ে বাধা দেওয়া জায়েয নেই।

এমনকি স্ত্রী যদি [মাহরামসহ শরীয়তের যাবতীয় বিধান মেনে] হজে যাওয়ার জন্য সক্ষম হন এবং যেতেও চান আর স্বামী তাকে যেতে নিষেধ করেন, তা হলে স্ত্রীর জন্য স্বামীর এ [অবৈধ] আদেশ মান্য করা ওয়াজিব নয়।

প্রিয় মুসলিম ভাই আমার!

ওই ঘরের ছায়ায় জীবন কতই না সুখী ও শান্তিময়, যে ঘরের প্রতিটি সদস্য আল্লাহমুখী হয়! যে ঘরের প্রতিটি সদস্য আল্লাহ ﷻ-র আদেশ মান্যকারী ও নিষিদ্ধ বিষয় থেকে পরহেযকারী হয়।

৩. ইবাদত ও ধার্মিক জীবনের তারবিয়াত প্রদান

পুরুষের কর্তব্য পারিবারিক জীবনে পরিবারের সদস্যদের ইবাদত-বন্দেগী ও ধার্মিকতার উচ্চ স্তরে নিয়ে যাওয়ার জন্য চেষ্টা-মেহনত করা। এক্ষেত্রে তাদের ফরয বিধানাবলি আদায়ের ব্যাপারে তদারকি ও খোঁজ-খবর নেওয়াই যথেষ্ট নয়; বরং তাদেরকে সুন্নাত নফল ও মুস্তাহাবসমূহ আদায়ের প্রতিও উৎসাহিত করতে হবে। যেমন, নবীজী ﷺ তাঁর পরিবার-পরিজনের সঙ্গে করতেন।

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা رضي الله عنها থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ أَحْيَا اللَّيْلَ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ وَجَدَّ وَشَدَّ الْمِئْزَرَ.

রমযানের শেষ দশক শুরু হওয়ার সাথে সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সারা রাত জেগে থাকতেন, নিজ পরিবারের সদস্যদের ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলতেন এবং তিনি নিজেও জোরালোভাবে ইবাদতে লেগে যেতেন। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২০২৪, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২০০৮, ভাষ্য মুসলিমের]

উম্মে সালামা رضي الله عنها থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَيْقَظَ لَيْلَةً فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ مَاذَا أُنْزِلَ اللَّيْلَةَ مِنْ الْفِتْنَةِ مَاذَا أُنْزِلَ مِنْ الْخَزَائِنِ مَنْ يُوقِظُ صَوَاحِبَ الْحُجُرَاتِ يَا رُبَّ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٍ فِي الْآخِرَةِ.

নবীজী ﷺ একরাতে ঘুম থেকে জেগে উঠে বললেন, সুবহানাল্লাহ! আজ রাতে কতই না ফিতনা নাযিল করা হল! আজ রাতে কতই না [রহমতের] ভাণ্ডার নাযিল করা হল! কে জাগিয়ে দিবে হুজরাগুলোর বাসিন্দাদের? ওহে শোন! দুনিয়ার অনেক বস্ত্র পরিহিতা আখেরাতে বিবস্ত্রা হয়ে যাবে। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১০৫৮]

আয়েশা رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا থেকে আরও বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন—

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فَإِذَا أَوْتَرَ قَالَ قُومِي فَأَوْتِرِي يَا عَائِشَةُ.

রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতে সালাত আদায় করতেন। বিতর আদায় করার সময় হলে বলতেন, হে আয়শা! উঠো! বিতর আদায় কর। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৭৪৪]

আবু হুরায়রা رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবীজী ﷺ ইরশাদ করেছেন—

رَحِمَ اللَّهُ رَجُلاً قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ رَحِمَ اللَّهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا فَإِنْ أَبَى نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاءَ.

আল্লাহ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ওই ব্যক্তির উপর রহম করুন, যে রাত জেগে সালাত আদায় করে; অতঃপর স্বীয় স্ত্রীকে ঘুম থেকে জাগ্রত করে। আর যদি সে ঘুম থেকে উঠতে না চায়, তা হলে তার চোখে পানি ছিটিয়ে দেয় [নিদ্রাভঙ্গের জন্য]। আল্লাহ ওই নারীর উপর রহম করুন, যে রাতে উঠে সালাত আদায় করে এবং স্বীয় স্বামীকে জাগ্রত করে। যদি সে ঘুম থেকে উঠতে অস্বীকার করে, তা হলে তার চোখে পানি ছিটিয়ে দেয়। [সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ১৩০৮, সুনানে নাসায়ী, হাদীস নং ১৬১০]

আবু ওয়াইল رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

غَدَوْنَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ يَوْمًا بَعْدَ مَا صَلَّيْنَا الْغَدَاةَ فَسَلَّمْنَا بِالْبَابِ فَأَذِنَ لَنَا قَالَ فَمَكَثْنَا بِالْبَابِ هُنَيَّةً قَالَ فَخَرَجَتِ الْجَارِيَةُ فَقَالَتْ أَلاَ تَدْخُلُونَ فَدَخَلْنَا فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ يُسَبِّحُ فَقَالَ مَا مَنَعَكُمْ أَنْ تَدْخُلُوا وَقَدْ أُذِنَ لَكُمْ فَقُلْنَا لاَ إِلاَّ أَنَّا ظَنَنَّا أَنَّ بَعْضَ أَهْلِ الْبَيْتِ نَائِمٌ. قَالَ ظَنَنْتُمْ بِآلِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ غَفْلَةً قَالَ ثُمَّ أَقْبَلَ يُسَبِّحُ حَتَّى ظَنَّ أَنَّ الشَّمْسَ

قَدْ طَلَعَتْ فَقَالَ يَا جَارِيَةُ انْظُرِى هَلْ طَلَعَتْ قَالَ فَنَظَرَتْ فَإِذَا هِىَ لَمْ تَطْلُعْ فَأَقْبَلَ يُسَبِّحُ حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ طَلَعَتْ قَالَ يَا جَارِيَةُ انْظُرِى هَلْ طَلَعَتْ فَنَظَرَتْ فَإِذَا هِىَ قَدْ طَلَعَتْ. فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى أَقَالَنَا يَوْمَنَا هَذَا وَلَمْ يُهْلِكْنَا بِذُنُوبِنَا.

একদিন সকালে ফজরের সালাত আদায়ের পর আমরা আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ رضي الله عنه-র কাছে গেলাম। আমরা দরজায় দাঁড়িয়ে সালাম করলে তিনি আমাদের অনুমতি দিলেন। রাবী আবু ওয়াইল رضي الله عنه বলেন, আমরা কিছুক্ষণ দরজায় অবস্থান করলাম। তখন বাঁদি বেরিয়ে এসে বলল, আপনারা প্রবেশ করছেন না কেন? আমরা তখন প্রবেশ করলাম। তিনি [আবদুল্লাহ رضي الله عنه] বসে বসে তাসবীহ পড়ছিলেন। তিনি বললেন, তোমাদের অনুমতি দেওয়া সত্ত্বেও কীসে তোমাদের প্রবেশে বাধা দিয়েছিল? তখন আমরা বললাম, না [তেমন কিছু নয়।] তবে কিনা আমরা ধারণা করেছিলাম– ঘরের কেউ হয়তো ঘুমিয়ে রয়েছে। তিনি বললেন, ইবনে উম্মে আব্দ এর পরিবারে তোমরা আলসেমী ও উদাসীনতার ধারণা করলে? [তোমরা কি ধারণা করলে যে, আমার পরিবারের লোকজন ফজরের সালাতের জন্য ওঠে না? কিংবা তারা ফজরের পর আল্লাহ سبحانه وتعالى-র তাসবীহ পাঠ করে না? আল্লাহ سبحانه وتعالى-র যিকির করে না?] রাবী [আবু ওয়াইল] বলেন, এরপর তিনি তাসবীহ পাঠ শুরু করলেন। পরে যখন ধারণা করলেন– সূর্য উদিত হয়েছে, তখন বললেন, হে দাসী! দেখ তো সূর্য উঠেছে কি না? রাবী বলেন, সে নজর করে দেখল যে, তখনও সূর্য উঠেনি। তিনি আবার তাসবীহ পাঠ শুরু করলেন। অবশেষে যখন তাঁর ধারণা হল সূর্য উদিত হয়েছে, তখন বললেন, হে দাসী! দেখ তো সূর্য উঠেছে কি? এবার সে দেখতে পেল যে, তা উদিত হয়েছে। তখন তিনি বললেন, সমস্ত প্রশংসা সেই সত্তার, যিনি আমাদের এ দিনটি ফিরিয়ে দিয়েছেন এবং

তিনি আমাদের পাপের কারণে আমাদের ধ্বংস করে দেননি। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৮২৩]

ইমাম নববী ﷺ বলেন, এ হাদীসে একজন পুরুষের স্বীয় পরিবার-পরিজন ও অধীনস্তদের দ্বীনী বিষয়ে দায়িত্ববান ও যত্নশীল হওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট ও পরিষ্কার হয়ে ফুটে আছে।

৪. উত্তম আখলাক, পবিত্রতা ও লজ্জাশীলতার তারবিয়াত প্রদান

মুজাহিদ ﷺ বলেন, তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে তাকওয়া অবলম্বনের ওসিয়ত কর এবং তাদেরকে আদব শিক্ষা দাও। [সহীহ বুখারী, তা'লীকান : ৪/১৮৬৮, অধ্যায় : তোমাদের অন্তর অন্যায়ের দিকে ঝুঁকে পড়েছে, তাই তোমরা উভয়ে তাওবা করলে ভালো হয়।]

পরিবারকর্তার উপর আবশ্যক– পরিবার-পরিজনের মাঝে উত্তম আখলাক সৃষ্টির মেহনত করা; উৎকৃষ্ট গুণাবলি বিকাশের চেষ্টা করা। উদাহরণস্বরূপ, তিনি শিক্ষা দিবেন– সত্যবাদিতা, আমানতদারিতা, উদারতা, বদান্যতা, অল্পেতুষ্টি, মহানুভবতা, সংযম ও ধীরস্থিরতা। আরও শিক্ষা দিবেন বিনয় ও লজ্জাশীলতা। পাশাপাশি শিক্ষা দিবেন– পিতা-মাতার সঙ্গে কেমন আচরণ করতে হয়, প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করতে হয়।

স্ত্রী-কন্যাদের যবানের প্রতি লক্ষ রাখাও পরিবারকর্তার কর্তব্য। যাতে তারা গীবত, পরনিন্দা ও অন্যের দোষচর্চায় লিপ্ত হতে না পারে।

এর পাশাপাশি স্ত্রী-কন্যাদের জন্য নেককার মহিলাদের মজলিসে বসা ও তাদের সাহচর্য গ্রহণের পরিবেশ তৈরি করে দিবেন। নেককারদের ছাড়া অন্যদের সঙ্গে ওঠাবসা ও মেলামেশার পথ বন্ধ করে দিবেন। নেককার মহিলাগণ ব্যতীত অন্যদের জন্য ঘরে প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ

করে দিবেন। কারণ, মহিলাদের অধিকাংশ মজলিসেই ব্যাপক গুনাহের ছড়াছাড়ি থাকে। পক্ষান্তরে নেককার মহিলাদের সান্নিধ্য ও সাহচর্য এ সকল গুনাহের মাত্রা অনেকটাই কমিয়ে দেয়।

কখনও কখনও নারী-মজলিসের কোনো কোনো দুরাচারী নারী আমাদের নারীদের এমন কিছু গর্হিত কর্ম শিক্ষা দেয়, যা মানুষের সুস্থ বিবেক ও শরীয়ত কোনোটাই সমর্থন করে না। যেমন, এক ভদ্রলোক বর্ণনা করেছেন, তার স্ত্রী একদিন তাকে পায়ুপথে সঙ্গামের জন্য আহ্বান করেছে। সাথে এ-ও বলেছে– তার এক বান্ধবী তাকে জানিয়েছে, সে তার স্বামীর সঙ্গো প্রায়ই এমনটা করে থাকে! নাউযুবিল্লাহ।

আমাদের নারীদের আর যে বিষয়টির প্রতি গুরুত্বের সঙ্গো সতর্ক করা উচিত, তা হচ্ছে– সময়ের হেফাজত করা। সময় নষ্ট না করা। কোনো কোনো মহিলা মোবাইল ফোনে দীর্ঘক্ষণ অযথা কথা বলে বহু সময় নষ্ট করে ফেলেন, যে কথায় কোনো ধরনের ফায়দা নেই। অতএব, একজন সচেতন দায়িত্বশীলের উচিত, স্বীয় পরিবারকে সময়ের সঠিক মূল্যায়ন ও যথাযথ কদর করার তালীম দেওয়া।

আরও দায়িত্ব হচ্ছে– অপরিচিত পুরুষদের সঙ্গো কীভাবে কথা বলতে হয়, তার পদ্ধতি ও আদব শিক্ষা দেওয়া। পরপুরুষের সঙ্গো কথা বলা ও আলাপ-আলোচনার ক্ষতিকর দিক নিয়ে যথাযথভাবে সতর্ক করা। তা ছাড়া নারীরা কোনো ওলীমা-অনুষ্ঠান বা অন্যকোনো অনুষ্ঠানে যাওয়ার আগে সেখানকার প্রকৃত অবস্থা যাচাই করে নেওয়া, সেখানে কোনো ধরনের গর্হিত কাজ বা পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে কি না– তার খোঁজ-খবর নেওয়া পরিবারকর্তারই দায়িত্ব।

নারীরা যে হিজাব ও পর্দা পরে বাইরে বের হন, তার ব্যাপারেও খোঁজ-খবর রাখা পরিবারকর্তার দায়িত্ব– তা শরয়ী পর্দার জন্য পর্যাপ্ত ও যথেষ্ঠ কি না? সম্পূর্ণ দেহ পূর্ণাঙ্গারূপে আচ্ছাদন করতে সক্ষম কি না? সেটি ঘন, গাঢ় ও পুরু কি না? সুগন্ধি থেকে মুক্ত কি না?

পুরুষদের পোশাকের সাথে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ কি না? কাফের-মুশরিকা নারীদের পোশাকের সাথে পার্থক্য ও ব্যবধান আছে কি না? যথেষ্ট প্রশস্ত ও ঢিলে কি না? অসংকীর্ণ ও মোটাসেটা কি না?

অত্যন্ত আক্ষেপ ও দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, কোনো কোনো পুরুষের চরিত্রে– হাঁ, কোনো কোনো মুসলিম পুরুষের চরিত্রে বে-গায়রতি, আত্মমর্যাদাবোধহীনতা, নষ্টামি ও লাম্পট্যের উপস্থিতি থাকে। অনুভব-উপলব্ধিতে থাকে মূর্খতা ও নির্বুদ্ধিতা! তারা তাদের স্ত্রী-কন্যা-বোনদের পবিত্রতা ও চারিত্রিক নিষ্কলুষতার প্রতি যত্নবান না! পর্দা-পুশিদার কোনো তদারকি করে না। আপনি দেখবেন, এ ধরনের লোক তাদের কন্যাদের স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেয়; নিজেদের ইচ্ছামতে চলাফেরা করতে দেয়। মেয়েরাও যখন যেখানে ইচ্ছা চলে যাচ্ছে; যার সঙ্গে ইচ্ছা চলে যাচ্ছে! তাদের কোনো জবাবদিহিতা নেই, ধরা-বাধা নেই; কোনো তত্ত্বাবধায়ক নেই। এ বিষয়ে সেসকল পুরুষকে তিরস্কার-ভর্ৎসনা করা হলে তারা এ বলে অজুহাত পেশ করে– সে তো এখনও অনেক ছোট! কিংবা তার ব্যাপারে আমার পূর্ণ আস্থা আছে!

কেউ কেউ স্ত্রী-পরিজন ও কন্যাদের নিয়ে বিভিন্ন পার্কে, বাগানে, বিনোদন কেন্দ্রে ঘুরতে যান। সেখানে গিয়ে তাদের লাগাম সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করে দেন। তারা আপন মনে যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে ঘুরে বেড়ান, খেলাধুলা করেন। পর্দার কোনো বালাই থাকে না। হিজাব খুলে যায়। অনেকের দেহও উন্মুক্ত হয়ে যায়! সামগ্রিকভাবে এসব বিষয়ে তারা চূড়ান্ত অবহেলা ও উদাসীনতার পরিচয় দেন।

এর চাইতেও নিকৃষ্ট ও ভয়াবহ ব্যাপার হচ্ছে– অনেকেই তাদের স্ত্রী-কন্যাদের একবার জিজ্ঞাসাও করেন না– তারা কোথায় যাচ্ছে? কোত্থেকে আসছে? বরং স্ত্রী-কন্যারা আদেশ করছে– 'আমাদের অমুক স্থানে পৌঁছে দাও' আর অমনিই তারা সেখানে পৌঁছে দিচ্ছেন। একবার জানতেও চাচ্ছেন না– তারা যেখানে যাচ্ছে বা যেতে চাচ্ছে, সেখানে তাদের কী কাজ? কিংবা সেখানকার অবস্থা ও পরিস্থিতিই বা কী?

আরও কদর্য ও জঘন্য হচ্ছে– অনেকে তাদের স্ত্রী-পরিজনদের এতটাই ছাড় দিয়ে রেখেছেন যে, তারা যেখানে ইচ্ছা সেখানে আসা-যাওয়া করছে কেবল ড্রাইভারকে সঙ্গে নিয়ে!

প্রিয় পাঠক!

এ কি নোংরা ও কদর্য নয়? এতে করে কি বিভিন্ন অন্যায় ও গর্হিত কর্ম সংঘটিত হয় না? সমাজে বিভিন্ন অপ্রীতিকর ঘটনা ও বড় ধরনের বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় না?

মনে রাখবেন, একজন পুরুষ এ সবকিছুর ব্যাপারেই জিজ্ঞাসিত হবেন। আমাদের সকলের জন্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ-র জীবনে রয়েছে উত্তম আদর্শ ও নমুনা। দেখুন, এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর স্ত্রীদের প্রতি কতটা গায়রতওয়ালা ও আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন ছিলেন! হযরত আয়েশা رضي الله عنها থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

> دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِى رَجُلٌ قَاعِدٌ فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ. قَالَتْ فَقَالَ انْظُرْنَ إِخْوَتَكُنَّ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ.
>
> একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার কাছে এলেন। তখন আমার কাছে একজন পুরুষ বসা ছিলেন। এতে তাঁর মন অতি ভারাক্রান্ত হল এবং আমি তাঁর চেহারায় ক্রোধের আলামত দেখতে পেলাম। তিনি [আয়েশা رضي الله عنها] বলেন, আমি তখন বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! এ ব্যক্তি আমার দুধভাই। তিনি [আয়েশা رضي الله عنها] বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, কারা তোমাদের দুধভাই– তা তোমরা ভালো করে দেখে নিয়ো। কেননা, 'রাযাআত' সাব্যস্ত হয় যখন দুধপানের দ্বারা সন্তানের ক্ষুধা নিবারিত হয়। [অর্থাৎ দুগ্ধপানের মেয়াদের ভিতর দুধ পান করলে তবেই কেবল রাযাআত সাব্যস্ত হয়।] [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫১০২, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৪৫৫, ভাষ্য মুসলিমের]

অর্থাৎ তোমরা কাউকে দুধভাই বলে ডাকতে এবং তাদেরকে তোমাদের ঘরে প্রবেশ করতে দেওয়ার পূর্বে খুব ভালোভাবে যাচাই করে নিয়ো, তাদের দুধপান কি দুধপানের মেয়াদের ভিতর হয়েছে না মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পর হয়েছে। দুধপান যদি দুধপানের মেয়াদের পর হয়ে থাকে, তা হলে এ দুধপানের দ্বারা রাযাআত সাব্যস্ত হবে না। ফলে তারা তোমাদের দুধভাই বলেও বিবেচিত হবে না। আর তখন তাদের সাথে তোমাদের দেখা-সাক্ষাত না-জায়েয হওয়ার বিষয়টি তো বলাই বাহুল্য।

৫. চক্রান্তকারীদের চক্রান্ত সম্পর্কে সতর্ক করা

ভ্রষ্টতা, বিচ্যুতি ও স্খলনের হাত থেকে পরিবারকে রক্ষা করার গুরুত্বপূর্ণ একটি পন্থা হচ্ছে– পরিবারের সদস্যদেরকে চক্রান্তকারীদের চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র ও তাদের জঘন্য ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কে অবহিত করা। ঘর, সংসার ও পরিবার ধ্বংস করা এবং পরিবারের সদস্যদের পথভ্রষ্ট ও বিভ্রান্ত করার জন্য তারা যেসব চক্রান্ত ও জঘন্য কর্মপন্থা বাস্তবায়ন করে চলেছে, সে সম্পর্কে পরিবারকে সতর্ক করা। চক্রান্তকারীরা তাদের চক্রান্ত বাস্তবায়ন করার জন্য মধুর মধ্যে বিষ ঢুকিয়ে দিচ্ছে! ভ্রষ্টতা, নোংরামি ও নষ্টামিকে সমাজের সামনে উপস্থাপন করছে বাহ্যত সুন্দর মোড়কে! এসবকে অভিহিত করছে আসল রূপ ও নাম আড়াল করে ভিন্ন ভিন্ন চটকদার নামে!

আমাদের নারীদের যেসব বিষয়ে গুরুত্বের সাথে সতর্ক করা উচিত,

তার মধ্যে শীর্ষস্থানীয় হচ্ছে নিম্নোক্ত দু'টি বিষয়। যথা–

এক. চক্রান্তকারীরা সর্বাত্মক চেষ্টা করছে– নারী থেকে পর্দা খুলে ফেলতে; পর্দা ও নারীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিতে। নারীকে ঘরের নিরাপদ আশ্রয় থেকে টেনে বাইরে বের করে আনতে। যাতে তাদেরকে ব্যবসার পন্য আর ভোগ্য সামগ্রী বানাতে পারে। আর একেই তারা অভিহিত করছে 'নারী স্বাধীনতা' নামে।

দুই. তারা চাচ্ছে ইসলামী পরিবার-ব্যবস্থাকে সমূলে ধ্বংস করে দিতে; পারিবারিক সুন্দর চিত্রটিকে মুছে ফেলতে। যেকোনো উপায়ে মুসলিম উম্মাহর সংখ্যা কমিয়ে আনতে। আর একে তারা নামকরণ করছে 'পরিবার পরিকল্পনা' নামে।

এ সকল চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র বাস্তবায়ন করার জন্য বহু স্যাটেলাইট চ্যানেল চালু করা হয়েছে। যে চ্যানেলগুলোর জন্মই হয়েছে মানুষের আখলাক-চরিত্র নষ্ট করার জন্য; আত্মিক পবিত্রতা ও নিষ্কলুষতাকে গলা টিপে হত্যা করার জন্য; সর্বোপরি মুসলিম পরিবার ও ইসলামী পরিবার-ব্যবস্থাকে সমূলে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য।

৬. অন্যায়-মন্দকর্ম থেকে পরিবারকে হেফাজত করা

বর্তমান যামানায় অনেক পিতা ও অভিভাবক নিজ পরিবার-পরিজন ও সন্তান-সন্ততির হকের ব্যাপারে যথেষ্ট অবহেলা করে থাকেন; অনেকে অবহেলা ও উদাসীনতার চূড়ান্ত করে থাকেন। ছোট ছোট কোমলমতি শিশুরা তাদের ঘরেই প্রতিনিয়ত বিভিন্ন অন্যায়, অশ্লীল ও নোংরা ক্রিয়াকর্ম প্রত্যক্ষ করে থাকে। ফলে ধীরে ধীরে তাদের অন্তরে সেসব অন্যায় ও গুনাহের বীজ রোপিত হতে থাকে; অনবরত তাদের কোমল হৃদয়ে সেসবের কালো দাগ পড়তে থাকে।

বহু মুসলিম ঘরে আজ যেসব অন্যায়কর্ম ও গর্হিত বিষয়াশয় বিদ্যমান, সেগুলি মৌলিকভাবে তিন ভাগে বিভক্ত। যথা–

এক. গৃহকর্তার সঙ্গে সম্পৃক্ত গর্হিত বিষয়সমূহ। এ প্রকারের বিষয়সমূহ পরিবার ও শিশুদের জন্য খুবই ক্ষতিকর। কেননা, শিশুরা তাদের অল্প বয়স থেকেই, বেড়ে ওঠার সময় থেকেই অভিভাবকদের এসব কাজ করতে দেখছে। যেমন, ধূমপান করা, টিভি-সিনেমা দেখা ইত্যাদি।

কেউ কেউ তাদের সন্তানদের গুনাহ করতে, গুনাহের কাজ করতে নিষেধ করেন ঠিক, কিন্তু তারা নিজেরাই আবার সেই কাজে, সেই

গুনাহে লিপ্ত হন; এমনকি সন্তানদের সামনেই! অতঃপর পরে এক সময় অসহায় ভঙ্গিতে প্রশ্ন করেন– কেন যে আমার সন্তানরা এভাবে বখে গেল?

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এক শিক্ষক আমাকে তাদের ছাত্রদের কয়েকটি ঘটনা বর্ণনা করে শুনিয়েছেন। ছোট ছোট শিশুরা খুব স্বাভাবিকভাবেই তাদের পরিবারের অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন বিষয়াশয় ও গর্হিত কর্মসমূহ খোলাখুলিভাবে বলে ফেলে। এ সবের ডান-বাম ভাববার মতো বয়স ও বুদ্ধি কোনোটাই তাদের থাকে না। শিক্ষক বলছিলেন–

আমার এক ছাত্র –যার বয়স মাত্র ছয় বছর– একবার আমার সাথে কথা বলতে গিয়ে প্রসঙ্গক্রমে বলেছে– আমার পিতা আমাদের ঘরে মদ পান করেন। তার বন্ধুরা যখন একসঙ্গে মিলে মদ পানের জন্য তার কাছে আসেন, তখন তিনি আমাদেরকে তার ঘর থেকে বের করে দেন।

ছাত্রটির কথার প্রত্যুত্তরে শিক্ষক বললেন, হতে পারে তারা কোনো জুস বা কোমল পানীয় পান করেন?

ছাত্রটি দৃঢ়তার সাথে বলল, না; আমি জানি সেগুলো কোনো জুস বা কোমল পানীয় নয়; বরং সেগুলো মদ।

প্রিয় পাঠক!

লক্ষ করুন, এই যে ছোট্ট একটি শিশু, যার বয়স সবেমাত্র ছয় বছর, সে তার পিতার ব্যাপারে এমন বর্ণনা দিচ্ছে! আর পিতা মনে করেছেন– ছেলেকে ঘর থেকে বের করে দিলেই সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। তারা আর জানতেই পারবে না এখানে কী হচ্ছে! পিতা বেমালুম ভুলে গেছেন তার ছেলেরও একটা বুঝশক্তি আছে, যা দ্বারা সে অনেক কিছুই বুঝতে পারে।

অপর এক ছাত্র তার শিক্ষকের নিকট বর্ণনা করেছে– আমার পিতা আমাদের খাদেমার সঙ্গো তা-ই করেন, যা করেন আমার মা আমাদের ড্রাইভারের সঙ্গো! [নাউযুবিল্লাহ]

অতএব, এসব শিশু যখন বড় হবে, তখন আমরা তাদের থেকে কী আশা করব? তারা তখন কী ধরনের জীবন যাপনে অভ্যস্ত হবে? তাদের থেকে কেমন ধরনের আচার-আচরণ ও ব্যবহার আশা করব? অথচ তারা প্রতিনিয়ত তাদের পরিবারে এ জাতীয় অন্যায় অশ্লীল ও গর্হিত ক্রিয়াকর্ম প্রত্যক্ষ করে আসছে!

দুই. নারী ও শিশুদের সাথে সম্পৃক্ত গর্হিত বিষয়াশয়। যা গৃহকর্তা নিজেই স্ত্রী-পরিজন ও পরিবারের সদস্যদের জন্য সরবরাহ করে থাকেন। হয়তো এতে তার উদ্দেশ্য থাকে তাদেরকে কিছুটা আনন্দ দেওয়া; একটু বিনোদনের ব্যবস্থা করে দেওয়া। তাদের ভিতর গুনাহ ও অকল্যাণের বীজ বপনের কোনো নিয়তই হয়তো তার থাকে না।

কিন্তু এভাবে আমাদের শিশুদের হাতের নাগালে এমন অনেক বস্তু এসে যায়, যা আমাদের দ্বীন-ধর্ম ও বিশ্বাসের মূলে আঘাত করে যায়; আকীদা-বিশ্বাসের ভিত্তিই নাড়িয়ে দেয়। তাদের মনে কুফর-শিরকের বীজ বপন করে যায়। উদাহরণস্বরূপ, কোনো কোনো কার্টুন আমাদের শিশুদের অবুঝ মনে জাদু-মন্ত্রের ভালোবাসা গ্রথিত করে দেয়। অথচ জাদু-মন্ত্র শিরকের অন্তর্ভুক্ত। আমরা কোনো কোনো কার্টুন ফিল্মে কিংবা ভিডিও গেমসে দেখতে পাই– জাদুকর একজন সৎ ও উপকারী লোক। সে নির্দোষ, নিরাপরাধ ও নিরীহ লোকদের সেবা করে। তাদের কল্যাণার্থে কাজ করে। অপরদিকে সে জালিম, অপরাধী ও দুষ্টুদের হত্যা করে। আপনি দেখবেন, এভাবে শিশুদের মনে বদ্ধমূল হয়ে যাবে– জাদুকর পরোপকারী ও অন্যের সাহায্যকারী।

প্রিয় পাঠক!

একটু ভাবুন! কীভাবে আমাদের শিশুদের ব্রেইন ওয়াশ করা হয়; কীভাবে তাদের মস্তিষ্কে ভ্রষ্টতা ও বিকৃতি ঢুকিয়ে দেওয়া হয়!

প্রিয় পাঠক!

আমার কথার অর্থ এই নয় যে, পরিবার-পরিজন ও শিশুদের খেলাধুলা ও বিনোদনের একেবারেই কোনো সুযোগ দেওয়া যাবে না; কিংবা বৈধ নির্দোষ ও সুস্থ বিনোদন ও খেলাধুলাও করতে দেওয়া যাবে না। না; বরং আমি বলতে চাচ্ছি– পিতা ও অভিভাবকের উপর পরিবার-পরিজন ও শিশুদের হক এই যে, তারা তাদের জন্য উপকারী খেলাধুলার সামগ্রী সরবরাহ করবেন; নির্দোষ ও সুস্থ বিনোদনের আসবাব ব্যবস্থা করে দিবেন। আর তাদেরকে এমন সব জিনিস ও খেলাধুলার সামগ্রী থেকে দূরে রাখবেন, যা তাদের দ্বীন-ধর্ম ও বিবেক-বুদ্ধিকে নষ্ট করে দেয়; বিকৃত করে দেয়।

আমরা যখন জানতে পারি, কোনো লোক তার পরিবারে, তার ঘরে এমন সব জিনিস সরবরাহ করেন, যা তাদেরকে নষ্ট করে দেয়, বিকৃত করে দেয়, আমাদের ধারণা– এ সবের মাধ্যমে তিনি তাদেরকে আনন্দ দিতে চান। কিছুটা বিনোদনের সুযোগ করে দিতে চান। আর এমনটা করতে গিয়ে তিনি বেমালুম ভুলে যান, এ সকল বিষয় কী কী ফাসাদ ও অনর্থ সৃষ্টি করতে পারে। কী কী ধ্বংস ডেকে আনতে পারে!

আমরা এমনটা বিশ্বাস করি না যে, কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে তার পরিবার ধ্বংসের জন্য কোনো কাজ করবেন। তবে আমি এমন ঘটনাও শুনেছি, যা সুস্থ বিবেক ও তবিয়ত কোনোভাবেই মেনে নিতে পারে না।

এক মেয়ের বর্ণনা– আমার পিতা আমাদের ঘরে অশালীন ফিল্ম নিয়ে আসতেন এবং সেগুলো তার সঙ্গে দেখার জন্য আমাকে বাধ্য করতেন। অথচ আমার বয়স তখন একেবারেই কম! আমি তখনও ভালোভাবে তেমন কিছুই বুঝে উঠতে শিখিনি।

আরেক মেয়ের বক্তব্য— আমাদের শিশুকাল থেকেই আমাদের পিতা গরমের ছুটিতে আমাদের নিয়ে বিভিন্ন অমুসলিম রাষ্ট্রে বেড়াতে যেতেন। সেখানে আমাদেরকে বিভিন্ন নাট্যশালা, পার্টি সেন্টার ও ক্লাবে নিয়ে যেতেন। তারপর আমরা যখন বড় হলাম, প্রাপ্তবয়স্ক হলাম, তখন তিনি আমাদেরকে অমুসলিম-কাফের যুবকদের সঙ্গে নাচতে, নৃত্য করতে আদেশ করতেন। তাদের সাথে সহনৃত্যে অংশগ্রহণ করতে বলতেন। তিনি নিজ হাতে আমাদেরকে সেসব যুবকের কাছে দিয়ে আসতেন, যাতে আমরা তাদের সাথে নাচি-গাই; আর তারা আমাদের নিয়ে যা ইচ্ছা তা-ই করে!!

প্রিয় পাঠক!

এ ঘটনা দু'টি আমি নিজে শুনেছি; কেউ মাধ্যম হয়ে আমাকে শোনায়নি।

এগুলো আমাদের ইসলামী সমাজেরই দৃষ্টান্ত। আমাদেরই পারিবারিক চিত্র। আমরা এখানে আমেরিকা, ইংল্যান্ড কিংবা কোনো কাফের রাষ্ট্রের সামাজিকতা নিয়ে কথা বলছি না; কথা বলছি আমাদের ইসলামী সমাজ নিয়ে। আমাদের সমাজেরই বিদ্যমান কিছু বিষয়াশয় নিয়ে। হাঁ, পাঠক! আমাদের কেউ কেউ এভাবেই তাদের সন্তানদের লালন-পালন করেন। অতঃপর এক সময় আমরা বলি— কেন আমাদের সমাজে এভাবে অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ল?! কেন আমাদের সমাজে অন্যায়-অশ্লীলতা ও গর্হিত কাজের এত ছড়াছড়ি?!

তিন. সামাজিক সেসকল অনাচার ও গর্হিত কাজ, যেগুলো আমাদের পরিবারে অনুপ্রবেশ করে অতি সঙ্গোপনে; আমাদের অলক্ষে। কেননা, পথে-ঘাটে হাটে-বাজারে স্কুল-বিদ্যালয়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ফেতনা-ফাসাদ ও গর্হিত বিষয় খুব সহজেই আমাদের ঘরে অনুপ্রবেশ করে ফেলে। কারণ, আমাদের পরিবার-পরিজন ও সন্তানরা সেসব স্থানে যায় এবং সেখানে গিয়ে নেককার-বদকার, ভালো-মন্দ সব রকমের মানুষের সঙ্গেই মেলামেশা করে। আর

সকলেরই জানা– আমাদের আশপাশে, আমাদের সমাজে ফেতনা-ফাসাদেরই ছড়াছড়ি; অন্যায়-অনাচারেরই বাড়াবাড়ি। অতএব, গৃহকর্তা ও পরিবারের দায়িত্বশীল অভিভাবকের কর্তব্য, আবশ্যক– সমাজের এ দিকটি সম্পর্কে, সমাজের এ অন্ধকার বিষয়গুলোর ব্যাপারে স্বীয় সন্তান-সন্ততি ও পরিবারবর্গকে সতর্ক করা; সাবধানতার তালীম দেওয়া।

একজন কল্যাণকামী দরদী ও খাঁটি মুমিনের উচিত, সর্বদাই দোয়া করা– যেন আল্লাহ ﷻ তার পরিবারকে এ সকল গর্হিত বিষয়াশয় ও ক্রিয়াকর্ম থেকে সম্পূর্ণরূপে হেফাজত করেন; বর্তমান সমাজে ছড়িয়ে পড়া এ সকল ধ্বংসাত্মক উপসর্গ থেকে পরিপূর্ণরূপে রক্ষা করেন।

আল্লাহ ﷻ-র নবী লূত عليه السلام যখন একটি ভ্রষ্ট, অসুস্থ ও বিকৃত রুচির অধিকারী সম্প্রদায়ের মাঝে ছিলেন, তিনি ও তাঁর পরিবারের অশ্লীলতা থেকে দূরে থাকার বিষয়টি যখন তাঁর সম্প্রদায় কোনোভাবেই মেনে নিতে পারছিল না; সর্বোপরি এ কারণে তাঁর সম্প্রদায় যখন তাঁর উপর ও তাঁর পরিবারের উপর বিভিন্ন ধরনের চাপ ও বল প্রয়োগ করছিল, তখন লূত عليه السلام কী বলেছিলেন? কী করেছিলেন?

তিনি তখন আল্লাহ ﷻ অভিমুখী হয়েছিলেন, আল্লাহ ﷻ-র কাছে আশ্রয় চেয়েছিলেন এবং আল্লাহ ﷻ-কে ডেকে বলেছিলেন–

﴿رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ﴾

হে আমার পালনকর্তা! আমাকে এবং আমার পরিবারবর্গকে তারা যা করে, তা থেকে রক্ষা কর। [সূরা শুআরা : ১৬৯]

তিনি তাঁর পরিবারকে অন্যায়-অশ্লীল ও গর্হিত কাজ থেকে দূরে ও নিরাপদে রাখতে একনিষ্ঠ ছিলেন। এখনও, বর্তমানেও প্রত্যেক সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন মুসলিমের জন্য উচিত এ কথা বলা–

﴿رَبِّ نَجِّنِيْ وَ اَهْلِيْ مِمَّا يَعْمَلُوْنَ﴾

হে আমার পালনকর্তা! আমাকে এবং আমার পরিবারবর্গকে তারা যা করে, তা থেকে রক্ষা কর। [সূরা শুআরা : ১৬৯]

কেননা, আমাদের বর্তমান সমাজে বিদ্যমান গর্হিত কাজ ও অশ্লীলতা লূত عليه السلام-র সম্প্রদায়ের অশ্লীলতার মতোই; বরং আরও বেশি। তাই আমাদেরও তেমনই দোয়া করা উচিত, যেমন দোয়া করেছিলেন আল্লাহ سبحانه وتعالى-র নবী লূত عليه السلام। আল্লাহ سبحانه وتعالى তাঁর দোয়া কবুলও করেছিলেন। আর এটাই হল সত্যবাদিতা ও একনিষ্ঠতার প্রতিদান। আল্লাহ سبحانه وتعالى ইরশাদ করেছেন–

﴿فَنَجَّيْنٰهُ وَ اَهْلَهٗۤ اَجْمَعِيْنَ . اِلَّا عَجُوْزًا فِي الْغٰبِرِيْنَ﴾

অতঃপর আমি তাঁকে ও তাঁর পরিবারবর্গকে রক্ষা করলাম। এক বৃদ্ধা ব্যতীত, সে ছিল ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত। [সূরা শুআরা : ১৭০-১৭১]

সে ছিল লূত عليه السلام-র স্ত্রী। কারণ, সে ছিল তার সম্প্রদায়ের ধর্মের অনুসারী।

এ পর্যায়ে আমরা নবীজী صلى الله عليه وسلم ও সাহাবায়ে কেরাম رضي الله عنهم-র কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করব, যেখানে দেখব– নবীজী صلى الله عليه وسلم ও সাহাবায়ে কেরাম رضي الله عنهم তাঁদের ঘরে-পরিবারে কীভাবে অন্যায়কর্মের প্রতিবাদ, প্রতিকার ও প্রতিরোধ করতেন।

নিজ ঘরে অন্যায়ের বিরুদ্ধে নবীজী صلى الله عليه وسلم-র প্রতিবাদ

عَنْ أَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْهُ فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاذَا أَذْنَبْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَالُ هَذِهِ النُّمْرُقَةِ قُلْتُ

اشْتَرَيْتُهَا لَكَ لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعَذَّبُونَ فَيُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ وَقَالَ إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّوَرُ لَا تَدْخُلُهُ الْمَلَائِكَةُ.

আয়েশা ﵂ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তিনি একটি ছবিওয়ালা বালিশ ক্রয় করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তা দেখতে পেয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে গেলেন; ভিতরে প্রবেশ করলেন না। [আয়েশা ﵂ বলেন] আমি তাঁর চেহারায় অসন্তুষ্টির ভাব দেখতে পেলাম। তখন বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কাছে তওবা করছি। আমি কী অপরাধ করেছি? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এ বালিশের কী ব্যাপার? [আয়েশা ﵂ বলেন] আমি বললাম, আমি এটি আপনার জন্য ক্রয় করেছি, যাতে আপনি টেক লাগিয়ে বসতে পারেন। তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, এই ছবি তৈরিকারীদের কেয়ামতের দিন শাস্তি দেওয়া হবে। তাদেরকে বলা হবে, তোমরা যা তৈরি করেছিলে, তা জীবিত কর। তিনি আরও বলেছেন, যে ঘরে এসব ছবি থাকে, সে ঘরে [রহমতের] ফেরেশতাগণ প্রবেশ করেন না। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৯৯৯, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২১০৭]

অপর এক বর্ণনায় এসেছে, আয়েশা ﵂ বলেছেন, অতঃপর যতক্ষণ না আমি সেই ছবি ঘর থেকে বের করেছি, ততক্ষণ নবীজী ﷺ ঘরে প্রবেশ করেননি। [আল ফাওয়াইদ লি আবি বকর আশ-শাফেয়ী : ৬৬৪]

আয়েশা ﵂-র সূত্রে অপর এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন—

كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مُخَنَّثٌ فَكَانُوا يَعُدُّونَهُ مِنْ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا وَهُوَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ وَهُوَ يَنْعَتُ امْرَأَةً قَالَ إِذَا أَقْبَلَتْ أَقْبَلَتْ بِأَرْبَعٍ وَإِذَا أَدْبَرَتْ أَدْبَرَتْ بِثَمَانٍ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلاَ أَرَى هَذَا يَعْرِفُ مَا هَا هُنَا لاَ يَدْخُلَنَّ عَلَيْكُنَّ قَالَتْ فَحَجَبُوهُ.

এক হিজড়া নবী কারীম ﷺ-র সহধর্মিণীগণের নিকট প্রবেশ করত। মানুষজন তাকে নারী-রহস্যের ধারণামুক্ত হিজড়াদের অন্তর্ভুক্ত মনে করত। একদিন নবীজী ﷺ ঘরে প্রবেশ করলেন। তখন সে তাঁর কোনো এক স্ত্রীর নিকট বসা ছিল আর সে এক মহিলার[দেহ সৌষ্ঠবের] বর্ণনা দিয়ে বলছিল– যখন সামনে অগ্রসর হয়, তখন চার [ভাঁজ] নিয়ে অগ্রসর হয় আর যখন পশ্চাতে ফিরে যায়, তখন আট [ভাঁজ] নিয়ে ফিরে যায়। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সাবধান! এ তো দেখছি এখানকার [নারী রহস্যের] বিষয়াদি বোঝে। সে যেন আর কখনও তোমাদের নিকট প্রবেশ না করে। তিনি [আয়েশা رضي الله عنها] বলেন, তারপর তাঁরা তার থেকে পর্দা করতেন। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২১৮১, এ হাদীসটি উম্মে সালামা رضي الله عنها-র সূত্রে বুখারী মুসলিম উভয় কিতাবেই আছে।]

বিলাপের বিরুদ্ধে উমর رضي الله عنه-র প্রতিবাদ

ইমাম বুখারী رحمه الله তাঁর সহীহ বুখারীতে 'পাপে ও বিবাদে লিপ্ত লোকদের অবস্থা অবগত হওয়ার পর তাদেরকে ঘর থেকে বের করে দেওয়া' অধ্যায়ে 'তা'লীক' হিসেবে উল্লেখ করেছেন, হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর বোন যখন বিলাপ করছিলেন, তখন উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে [ঘর থেকে] বের করে দিয়েছেন। [সহীহ বুখারী : ৩/১২২]

ইবনে মাসউদ رضي الله عنه-র ঘটনা

প্রিয় পাঠক!

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ رضي الله عنه-র নিম্নোক্ত ঘটনাটি লক্ষ করুন এবং তাতে গভীরভাবে চিন্তা করুন। তিনি যখন বলেছিলেন– আল্লাহ تعالى লানত করেছেন ওই সমস্ত নারীর উপর, যারা অন্যের শরীরে উল্কি

অঙ্কন করে, নিজ শরীরে উল্কি অঙ্কন করায়, যারা সৌন্দর্যের জন্য ভ্রু-চুল উপড়ে ফেলে ও দাঁতের মাঝে ফাঁক সৃষ্টি করে, এসব নারী আল্লাহ ﷻ-র সৃষ্টিতে বিকৃতি সাধন করছে।

এরপর বনী আসাদ গোত্রের উম্মে ইয়াকুব নামের এক মহিলার কাছে এ সংবাদ পৌঁছলে সে [আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ رضي الله عنه-র কাছে] এসে বলল, আমি জানতে পারলাম, আপনি এ ধরনের মহিলাদের প্রতি লানত করেছেন।

তিনি বললেন, আল্লাহ ﷻ-র রাসূল ﷺ যার প্রতি লানত করেছেন, আল্লাহ ﷻ-র কিতাবে যার প্রতি লানত করা হয়েছে, আমি তার প্রতি লানত করব না কেন? তখন মহিলা বলল, আমি দুই ফলকের মাঝে যা আছে তা [পূর্ণ কুরআনে কারীম] পড়েছি, কিন্তু আপনি যা বলছেন, তা তো এতে পাইনি।

আবদুল্লাহ رضي الله عنه বললেন, তুমি যদি কুরআন পড়তে, তা হলে অবশ্যই পেতে; তুমি কি [আল্লাহ ﷻ-র এ বাণী] পড়নি যে, [অনুবাদ]

﴿وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ٭ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا﴾

> ‘রাসূল তোমাদেরকে যা দেন, তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাক। [সূরা হাশর : ৭]

মহিলাটি বলল, হাঁ, নিশ্চয় পড়েছি।

আবদুল্লাহ رضي الله عنه বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ কাজ করতে নিষেধ করেছেন।

তখন মহিলা বলল, আমার মনে হয় আপনার পরিবারও এ কাজ করে।

তিনি বললেন, তুমি যাও এবং ভালোভাবে দেখে এসো।

এরপর মহিলা গেল এবং ভালোভাবে দেখে এল। কিন্তু তার দেখার কিছুই দেখতে পেল না। তখন আবদুল্লাহ رضي الله عنه বললেন, যদি আমার

স্ত্রী এমন করত, তা হলে সে আমার সঙ্গে একত্রে থাকতে পারত না। [বুখারী, হাদীস নং ৪৬০৪, মুসলিম, হাদীস নং ২১২৫]

আবু মুসা ﷺ-র পরিবারের অন্যায় কাজে বাধাদান

আবু বুরদা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আবু মুসা ﷺ কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। তাঁর মাথা তখন তাঁর পরিবারের এক মহিলার কোলে ছিল। সে মহিলা চিৎকার করে উঠল। তিনি তাকে তা থেকে বাধা দিতে পারেননি। যখন তাঁর জ্ঞান ফিরল, তখন তিনি বললেন, আমি তার থেকে সম্পর্কহীন, যার থেকে আল্লাহ ﷻ-র রাসূল ﷺ সম্পর্কচ্ছেদ করেছেন। যে ব্যক্তি [মৃতের শোকে] উচ্চৈঃস্বরে কান্নাকাটি করে, মাথার চুল মুণ্ডন করে এবং কাপড় ছিঁড়ে ফেলে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তার থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন। [বুখারী, হাদীস নং ১২৩৪, মুসলিম, হাদীস নং ১০৪, ভাষ্য মুসলিমের।]

প্রিয় পাঠক!

লক্ষ করুন! এই যে আবু মুসা আশআরী ﷺ! তিনি মৃত্যুশয্যায় থেকেও তাঁর পরিবারের সদস্যদের অন্যায়কর্মের প্রতিবাদ করেছেন; অন্যায়কর্মে বাধা প্রদান করেছেন। তা হলে সেই সমস্ত লোক কেন এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে না, যারা পুরোপুরি সুস্থ ও সক্ষম! কেন তারা তাদের পরিবারের সদস্যদের সৎকর্মের প্রতি, কল্যাণের প্রতি আহ্বান করে না! কেন তারা তাদের অন্যায়কর্ম ও অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ করে না! বাধা প্রদান করে না!

৭. নারীরা কাজের জন্য বের হলেও খোঁজ-খবর রাখা

চাকুরি বা কাজের জন্য নারীদের ব্যাপক হারে বাইরে বের হওয়া নিঃসন্দেহে বহু অনর্থের সৃষ্টি করে। প্রতিনিয়তই আমরা বিভিন্ন পরিবারে এমনসব করুণ, বেদনাদায়ক ও হৃদয়বিদারক ঘটনা শুনতে

পাই, যার কারণ বা উপলক্ষ হয় চাকুরি, কাজ বা অন্যকোনো প্রয়োজনে ব্যাপকহারে নারীদের বাইরে বের হওয়া।

এক মহিলা বের হয়েছেন কাজের সন্ধানে। চাকুরিও পেয়েছেন একটি কোম্পানিতে। সেই সুবাদে পরিচয় হয় এক পুরুষের সঙ্গো। কিছু দিন পর মহিলার স্বামী সফরে বের হন। শেষ ফলাফল দাঁড়ায়– স্বামীর অনুপস্থিতিতে মহিলাটি সেই আজনবি পুরুষটিকে প্রায়ই নিজ ঘরে অভ্যর্থনা জানায়!

– এ সম্পর্কের সূচনা কোত্থেকে?

– চাকুরি থেকে।

অতএব, দেখা যাচ্ছে, চাকুরি বা কাজের জন্য নারীদের ঘর থেকে বের হওয়া খুবই খতরনাক বিষয়; অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ ব্যাপার। এটা নিয়ন্ত্রণ করা দরকার। এক্ষেত্রে শরীয়তের যাবতীয় হুকুম-আহকাম ও বিধি-নিষেধ পরিপূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করা ও মেনে চলা দরকার।

বর্তমানে ধর্মরিপেক্ষতাবাদী, প্রগতিবাদী, আধুনিকতার ধ্বজাধারীসহ আল্লাহর সকল দুশমনের সবচেয়ে বড় টার্গেট ও লক্ষ্য হচ্ছে– নারীদের ঘর থেকে বের করে আনা। এ জন্যই আমরা দেখতে পাই– নারীর কর্মসংস্থানের ব্যাপারে তারা সদা তৎপর; সবচেয়ে বেশি সরব। অপর দিকে অগণিত পুরুষ চাকুরি না পেয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরলেও তাদের কোনো মাথা ব্যথা নেই। এভাবে তারা মূলত ইসলামী সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ও অজেয় দুর্গগুলো ধ্বংস করে দিতে চাচ্ছে!

৮. শৈশবেই সঠিক তারবিয়াতের প্রতি গুরুত্ব প্রদান

শিশুকাল থেকেই সন্তানাদির শিক্ষা-দীক্ষা ও তারবিয়াতের প্রতি মনোযোগী না হলে, মানসিকতার উন্মেষ ও বিকাশকালে তাদের যথাযথ তারবিয়াতের প্রতি অবহেলা ও উদাসীনতা প্রদর্শন করলে অধিকাংশ সময়ই ভবিষ্যত জীবনে সন্তানরা ভ্রষ্টতা, বিচ্যুতি ও

স্খলনের দিকে এগিয়ে যায়। কারণ, আমাদের সমাজ ও সামাজিকতা নানাবিধ সমস্যা ও অনাচারে পূর্ণ।

প্রিয় পাঠক!

এই যদি হয় সেই শিশুর অবস্থা, যার তারবিয়াতের ব্যাপারে যত্নের অভাব থাকে, তা হলে একবার ভেবে দেখুন, সেই শিশুর অবস্থা কী হবে, যার পিতা বা অভিভাবক নিজেই অসৎ, মন্দ ও দুরাচারী? ফাসাদ সৃষ্টিকারী?

মনে রাখবেন, সন্তানাদির তারবিয়াত ও সংশোধন করতে হয় তাদের শিশু বয়সেই। বড় হয়ে গেলে সংশোধনের ট্রেন ছেড়ে চলে যায়। তখন আর সংশোধন করা সম্ভব হয় না। তবে আল্লাহ ﷻ কারও উপর বিশেষ দয়া করলে সেটা ভিন্ন কথা।

একবার এক পিতা শায়খ বিন বায রহিমাহুল্লাহ-র নিকট এসে অভিযোগ করে বললেন, আমার সন্তানরা কেউ কখনও সালাত পড়ে না। আমি তাদেরকে বিভিন্নভাবে বুঝিয়েছি, উপদেশ দিয়েছি, বকাঝকা করেছি, গালিগালাজ করেছি, কিন্তু কোনো ফায়দাই হয়নি। এখন আমি আর কী করতে পারি?

শায়খ রহিমাহুল্লাহ বললেন, তাদেরকে উপদেশ-নসীহত করতে থাকুন। যখন তাদের বয়স দশ বছর হয়ে যাবে, তখন বালেগ হওয়ার আগ পর্যন্ত প্রয়োজনে শরীয়তসম্মত পন্থায় প্রহারও করুন। তবে বালেগ হয়ে গেলে বা বালেগ হওয়ার একেবারে কাছাকাছি চলে গেলে তখন আর মেরে কোনো ফায়দা হবে না। বরং তখনকার মার তাদের অন্তরে কেবল বিদ্বেষভাবই সৃষ্টি করবে; তাদেরকে উদ্ধত ও বেপরোয়া করে তুলবে। কখনও বা তারা 'একের বদলে দুই' ফিরিয়ে দিবে!

আরেক ব্যক্তি এসে অভিযোগ করে বললেন, শায়খ! আমার মেয়ে একাকী রাস্তায় বের হয়; মনমতো গাড়ি ভাড়া করে যেখানে ইচ্ছা চলে যায়। কোথায় যায়, কোত্থেকে আসে আমি কিছুই জানি না;

জানতে পারি না। আমি তাকে অনেক বুঝিয়েছি, বহু উপদেশ দিয়েছি, অনেক কথা বলেছি, কিন্তু আমার কোনো কথাই সে শোনেনি, শোনে না। বিষয়টি আমি তার মাকে বললাম। কিন্তু হিতে বিপরীত হল। মা-মেয়ে উভয়ে একযোগে আমার মুখের উপর চিৎকার করে বলে উঠল– এটা আমাদের নিজস্ব ব্যাপার। এ ব্যাপারে তুমি নাক গলাতে আসবে না। আমাদেরকে আমাদের মতো থাকতে দাও। অতএব, শায়খ! এখন আমি কী করি? কী করা উচিত? কী করতে পারি?

আমরা বলি, এটা অত্যন্ত সুদূর পরাহত বিষয় যে, শিক্ষা-দীক্ষা ও তারবিয়াতের বয়স পার হয়ে যাওয়ার পর আপনি তাদেরকে উপদেশ দিয়ে সংশোধন করতে চাচ্ছেন! তাদেরকে কথা মানানোর জন্য আদেশ করছেন! এবং চাচ্ছেন– তারা আপনার কথা শুনুক; আপনাকে মান্য করুক!!

মনে রাখবেন, শিক্ষা-দীক্ষা ও তারবিয়াত করার সময় হচ্ছে শিশুকাল। কোনো শিশু যে পরিবেশ, মানসিকতা ও বিশ্বাসের উপর বেড়ে ওঠবে, সে তার উপরই যুবক হবে; স্থায়ী হবে। অতএব, আমাদের সন্তানাদির ব্যাপারে আল্লাহ ﷻ-কে ভয় করা উচিত; শিশুকাল থেকেই তাদের তারবিয়াত করা উচিত। তারা এমন বয়স ও স্তরে পৌঁছার পূর্বেই তারবিয়াত করা উচিত, যেখানে পৌঁছে গেলে আমাদের তারবিয়াত, উপদেশ ও দিকনির্দেশনা তারা গ্রহণ করবে না।

তবে পূর্বোক্ত ব্যক্তি ও তার মতো অন্যদের কারোই আল্লাহ ﷻ-র রহমত থেকে নিরাশ হওয়া উচিত নয়। বরং তাদের উচিত– আপন পরিবার-পরিজন ও সন্তানাদিকে সব সময় নসীহত-উপদেশ করতে থাকা এবং তাদের জন্য সর্বদাই আল্লাহ ﷻ-র দরবারে দোয়া-প্রার্থনা করা। পাশাপাশি উপদেশদানের পন্থা ও পদ্ধতিতে ভিন্নতা ও বৈচিত্র্য আনা। কখনও সরাসরি কথা বলে; কখনও উপদেশমূলক ক্যাসেটের মাধ্যমে; কখনও পত্রের সাহায্যে– এভাবে বিভিন্ন পন্থায় উপদেশ দিবেন। কখনও বা কোনো নেককার দাঈয়া মহিলাকে দাওয়াত করে

ঘরে নিয়ে আসবেন– তাদেরকে বোঝানোর জন্য; উপদেশদানের জন্য। এভাবে একের পর এক পন্থা ও পদ্ধতি পরিবর্তন করে করে হেদায়েতের চেষ্টা করেই যাবেন। হতে পারে কোনো এক সময় আল্লাহ ﷻ তাদেরকে হেদায়েত দিয়ে দিবেন; তাদের অবস্থা ভালো করে দিবেন, কিংবা তাদের জন্য তাদের তাকদীরে লিখিত কোনো ফায়সালা কার্যকর করে দিবেন।

মুসলিম পরিবারের অভ্যন্তরে দাওয়াত পৌঁছানোর কয়েকটি মাধ্যম

প্রিয় পাঠক!

পূর্বের পৃষ্ঠাগুলোতে আমরা আলোচনা করেছি পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষার পদ্ধতি নিয়ে। সে আলোচনায় যতগুলো পন্থা ও পদ্ধতির কথা উঠে এসেছে, তার প্রায় সবগুলোই ছিল প্রত্যক্ষ ও সরাসরি সম্বোধন সম্বলিত মাধ্যম। এর পাশাপাশি পরোক্ষ অনেক মাধ্যমও রয়েছে। অনেক সময় দেখা যায়– পরোক্ষ সেই মাধ্যমগুলো প্রত্যক্ষ মাধ্যমের তুলনায় অধিক কার্যকর ও ফলপ্রসূ বলে প্রামণিত হয়।

তাই মুসলিম পরিবারের অভ্যন্তরে দাওয়াত পৌঁছানোর পরোক্ষ সেই মাধ্যমগুলোর কয়েকটি এখানে তুলে ধরা হচ্ছে। যেমন–

১. উত্তম আদর্শ

বর্তমান সময়ে অনেক প্রতিভাবান তরুন-যুবককে দেখা যায়, তারা লেখাপড়া ও বিদ্যার্জনের প্রতি খুবই মনোযোগী। আপনি এমন অনেককেই দেখবেন– তারা বিভিন্ন মুতুনের কিতাব [মূল ভাষ্যগ্রন্থ] মুখস্থ করতে খুবই তৎপর ও পরিশ্রমী। বিভিন্ন ইসলামী মজলিস ও হালকায় অংশগ্রহণও করে অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে। কিন্তু একই সময়ে আপনি দেখবেন, তারা আদব-আখলাক ও শিষ্টাচার শিক্ষা করা এবং

তা অর্জন করার প্রতি ততটা মনোযোগী নয়। ফলে এ ধরনের মানুষের কথাবার্তা, ওয়াজ-নসীহত ও উপদেশ মানুষের মাঝে তেমন প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয় না। তাদের কথা মানুষের হৃদয় স্পর্শ করতে পারে না। অথচ তাদের কাছে ইলমের সুবিশাল ভাণ্ডার রয়েছে।

– তা হলে এর কারণ কী?

– কারণ, মানুষের হৃদয়ের গভীরে পৌঁছার চাবি তাদের কাছে নেই। সেই চাবি হচ্ছে– আদব ও আখলাক।

নিঃসন্দেহে যে পরিবারকর্তা তার অধীনস্ত পরিবার-পরিজনকে আদব-আখলাক শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে উদাসীন থাকেন, তার উপমা সেই যুবকের ন্যায়, যে আদব-আখলাক শেখার ক্ষেত্রে অবহেলা করেছে। কেননা, এ ব্যক্তি তার পরিবার-পরিজন ও সন্তানাদির বিচারে একজন শিক্ষকের ন্যায়।

সুতরাং, একজন পরিবারকর্তা– যিনি তার পরিবারকে উপদেশ দিতে চান, সংশোধন করতে চান, তাদেরকে সঠিকরূপে ঈমানী তারবিয়াত করতে চান, তার জন্য জরুরি হচ্ছে– তিনি তাদের জন্য প্রতিটি ক্ষেত্রেই উত্তম আদর্শ ও নমুনা হবেন। শিক্ষার ক্ষেত্রে, ইবাদতের ক্ষেত্রে, আখলাকের ক্ষেত্রে, আদবের ক্ষেত্রে, তাদের জন্য ব্যয়ের ক্ষেত্রে, দয়া-উদারতা ও দানের ক্ষেত্রে।

কারণ, যিনি তার পরিবারকে উত্তম আখলাকের আদেশ করবেন, অতঃপর নিজেই তাদের সঙ্গে আখলাকের পরিচয় দিবেন না, তিনি কীভাবে আশা করতে পারেন যে, তার কথা তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে! তাদের মাঝে প্রভাব সৃষ্টি করবে! নবীজী ﷺ ইরশাদ করেছেন–

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ.

তোমাদের মধ্যে সে-ই উত্তম, যে তার পরিবারের কাছে উত্তম। [সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ৩৮৯৫, সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ১৯৭৭]

একজন আদর্শবান ব্যক্তির কাজ ও আমল অন্যের উপর তার কথার চেয়ে অনেক বেশি প্রভাব ফেলতে সক্ষম। উদাহরণস্বরূপ, আপনি আপনার ছোট ছেলেকে সালাতের গুরুত্ব সম্পর্কে বলুন, সালাত আদায়ের সঠিক পদ্ধতি শিক্ষা দিন, অতঃপর আপনি নিজেও দাঁড়ান এবং তার সামনে সালাত আদায় করে দেখিয়ে দিন। দেখবেন, আপনার ছেলে আপনার পাশে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছে। কেন, আপনি কি দেখেননি– অনেক সময় পিতাকে সালাত পড়তে দেখে ছোট্ট ছেলেও পাশে দাঁড়িয়ে সালাত পড়তে শুরু করে। অথচ তাকে কিন্তু সালাতের আদেশ করা হয়নি। ব্যাপারটি এমন নয় কি?

– অবশ্যই।

কিন্তু ছেলেকে সালাতের কথা বলে পিতা যদি নিজেই সালাত না পড়েন, তার সামনে সালাতের বাস্তব অনুশীলন করে দেখিয়ে না দেন, তা হলে দেখা যায়, ওই ছেলে কখনও সালাত পড়ে, কখনও পড়ে না।

– তা হলে দেখা যাচ্ছে, কথার তুলনায় কাজের প্রভাব বেশি পড়ে।

আপনি সেই সাহাবীকে দেখুন, যিনি প্রতি বার কুরআন খতম করার পর পরিবারের সকলকে একত্র করে তাদের জন্য দোয়া করতেন। যেন তিনি নীরবে তাদের বলতেন– আমি তো কুরআন খতম করে ফেলেছি। তোমরা খতম করবে কবে?

ফলে বিষয়টি তার পরিবার ও সন্তানদের মাঝে প্রতিযোগিতার বিষয়ে পরিণত হত। তিনি হযরত আনাস ইবনে মালেক ﵁। তাঁর ব্যাপারে বর্ণিত আছে, যখন তিনি কুরআনে কারীম খতম করতেন, তখন পরিবার-পরিজন ও সন্তানাদিকে একত্র করে তাদের জন্য দোয়া করতেন।

অতএব, কোনো পরিবার যখন দেখবে– তাদের পরিবারকর্তা তাদের তুলনায় অধিক কুরআন খতমকারী, তখন তারা এক্ষেত্রে তার

আনুগত্য ও অনুসরণের জন্য ভিতর থেকে এক ধরনের উৎসাহ ও তাড়া অনুভব করবে।

২. উৎসাহদান ও ভীতিপ্রদর্শন

অনেক সময় দেখা যায়, আল্লাহ ﷻ-র পথে দাওয়াত ও আহ্বানের ক্ষেত্রে –চাই তা পরিবার-পরিজনের মাঝেই হোক কিংবা অন্যদের মাঝে হোক– শুধু আদেশদান ও নিষেধকরণের মধ্যেই সীমাবন্ধ করাটা তেমন ফলপ্রসূ বলে প্রমাণিত হয় না। বরং একজন দাঈর জন্য তার দাওয়াতের পদ্ধতিতে মাঝে-মধ্যেই পরিবর্তন ও নতুনত্ব আনা প্রয়োজন। যাতে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির কাছে যথাযথ বার্তাটি গ্রহণযোগ্য পন্থায় পৌঁছানো সম্ভব হয় এবং তিনিও তা গ্রহণ করতে আগ্রহী হন।

কিছু কিছু যুবক –আল্লাহ ﷻ তাদের হেদায়েত করুন– নিজেদের পরিবারের ব্যাপারে অকার্যকর, ক্ষেত্রবিশেষ ধ্বংসাত্মক পন্থা অবলম্বন করে থাকে। তারা পরিবারের সদস্যদের কোনোরূপ ভূমিকা ও প্রস্তুতকরণ ছাড়াই কেবল বলে যায়– টেলিভিশন হারাম, ডিশ হারাম, গানবাদ্য হারাম, ছবি হারাম ইত্যাদি। প্রিয় পাঠক! তাদের কথা ও বক্তব্য এক শ' তে এক শ' ভাগই সত্য। এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও উপদেশদান ও সংশোধনের এ পদ্ধতি অনেক সময়ই কাঙ্ক্ষিত সুফল বয়ে আনে না। বরং অনেক সময় দাওয়াতী অঙ্গনে তা প্রতিবন্ধক হিসেবেই প্রমাণিত হয়।

মনে রাখবেন, একজন বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ব্যক্তি তিনিই, যিনি তার ওয়াজ-নসীহত ও উপদেশ শুরু করেন আল্লাহ ﷻ-র আজমত ও বড়ত্বের আলোচনা দিয়ে; বান্দার উপর আল্লাহ ﷻ-র কী কী হক রয়েছে– তার আলোচনা দিয়ে। অতঃপর আলোচনা করেন কেয়ামত দিবস সম্পর্কে, কেয়ামত দিবসে বান্দার হিসাব-নিকাশ ও প্রতিদান সম্পর্কে; জান্নাত-জাহান্নাম, মীযান, শাফাআত, হাউজে কাউসার ইত্যাদি সম্পর্কে।

এভাবে বিভিন্ন আলোচনার মাধ্যমে যখন সকলের মন উপদেশ গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে, তখন সেটাই হচ্ছে উপযুক্ত সময় বিভিন্ন হুকুম-আহকাম ও বিধি-বিধান বর্ণনা করার। সে সময় যেকোনো বিধান বর্ণনা করা হলে আশা করা যায় তা কার্যকর হবে; ফলপ্রসূ হবে। কারণ, উদ্দিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মন-মানসিকতা তখন কথা গ্রহণের জন্য প্রস্তুত থাকবে।

প্রিয় ভাই! আপনি আল্লাহ ﷻ-র কিতাব নিয়ে একটু ভাবুন! আল্লাহ ﷻ-র কালাম কি শুধু ফিকহী হুকুম-আহকাম ও বিধি-বিধান নিয়েই এসেছে? সেখানে কি আল্লাহ ﷻ শুধু এভাবেই বর্ণনা করেছেন যে, এটি হালাল, সেটি হারাম? না সেখানে আযাব-গযব, শাস্তি-ধমকি ও উৎসাহ-প্রেরণার কথাও উল্লেখ করেছেন?

আমাদের কুরআন পরকালের বিভিন্ন বিষয়াশয় ও বর্ণনায় ভরপুর। সেখানে ফিকহী হুকুম-আহকাম ও বিধানসম্বলিত আয়াতের পাশাপাশি বহু আয়াতে বর্ণিত হয়েছে আল্লাহ ﷻ-র বড়ত্ব, মহত্ব ও গুণাগুণের কথা। বহু আয়াতে বর্ণিত হয়েছে জাহান্নামের আগুন ও শাস্তির কথা। তাঁর পাকড়াও ও প্রতিশোধের কথা।

এক আয়াত শেষ করা হয়েছে, 'আল্লাহর আযাব বড়ই কঠিন' বলে, আরেক আয়াতের সমাপ্তি টানা হয়েছে 'নিশ্চয় আল্লাহ অত্যন্ত দয়ালু ও মেহেরবান' বলে।

প্রিয় পাঠক!

বিধান দেওয়ার ক্ষেত্রে এটাই হচ্ছে বিধাতার নিয়ম। তিনি ওয়াজ-নসীহত ও উৎসাহদান-ভীতিপ্রদর্শন ব্যতিরেকে কেবলই বিধান বর্ণনা করে যাননি। অতএব, কেউ যদি তার দ্বীনী দাওয়াত ও সংশোধনমূলক কার্যক্রমে সফলতা অর্জন করতে চান, কামিয়াব হতে চান, তা হলে অবশ্যই তাকে এই পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। অন্যথায় তার দাওয়াতী কার্যক্রমে অনেক বড় ত্রুটি থেকে যাবে– সে দাওয়াত তার পরিবার-পরিজনের মাঝে হোক কিংবা সাধারণ মানুষের মাঝে হোক।

৩. ‘মারকাযে তাহফীযুল কুরআনে’ নিয়ে যাওয়া

আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহ ﷻ-র শোকর, বর্তমানে ‘মারকাযে তাহফীযুল কুরআন’ এর ব্যাপকতা আমাদের জন্য আল্লাহ ﷻ-র এক বিশেষ নেয়ামত। এ মারকায যেমন পুরুষদের আছে, তেমন আছে নারীদেরও। আরও আনন্দের বিষয় হচ্ছে, এ মারকাযগুলো বর্তমানে প্রায় সব জায়গাতেই ছড়িয়ে পড়েছে। দেশের এমন কোনো অঞ্চল হয়তো পাওয়া যাবে না, যেখানে এ মারকায নেই।

যে পরিবারকর্তা পরিবারের অভ্যন্তরে দাওয়াতের কাজ করতে পারেন না কিংবা করলেও ত্রুটি হয়, সেটা তার ব্যস্ততার কারণেই হোক কিংবা জ্ঞানস্বল্পতা বা অন্য যেকোনো কারণেই হোক, তিনি তার এ ত্রুটি ও কমতির সুন্দর সমাধান খুঁজে পাবেন এ মারকাযগুলোতে। অবশ্য আমাদের এ কথার অর্থ এই নয় যে, আমরা তার এ ধরনের কমতি ও ত্রুটিকে সমর্থন করছি বা মেনে নিচ্ছি। বরং তার জন্য আবশ্যক হচ্ছে– পরিবারের তালীমের জন্য সময় বের করা। প্রথমে তিনি নিজে সংশোধন হবেন। নিজের ত্রুটি ও ঘাটতির ক্ষতিপূরণ করবেন। তারপর পরিবারের সদস্যদের তালীমের ব্যবস্থা করবেন।

যা হোক, বলছিলাম মারকাযে তাহফীযুল কুরআনের কথা। এ মারকাযগুলোর কল্যাণ ও উপকারিতা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট। বহু নারী এ সকল মারকাযের মাধ্যমে গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। এগুলোর সাথে যুক্ত ও সম্পৃক্ত হওয়ার পর তাদের অবস্থার আমূল পরিবর্তন হয়েছে। বরং অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে, কোনো কোনো নারীর উপর তাদের স্বামীরাও ততটা প্রভাব ফেলতে পারেননি, যতটা প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছে এ মারকাযগুলো।

সামগ্রিকভাবে বলা যায়, এ মারকাযগুলো নারীসমাজের সংশোধনে ব্যাপক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে। অনেকেই সেখান থেকে

দাওয়াতের পথ-পদ্ধতি ও পন্থা রপ্ত করে অন্যান্য মুসলিম বোনদের মাঝে দাওয়াতের কাজ করে যাচ্ছেন পুরোদমে।

তবে এতসব কিছু সত্ত্বেও এখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি কথা বলে রাখতে চাই, তা হচ্ছে– নারীদের ঘর থেকে বের হওয়াটাই সাধারণত তাদের নিজেদের জন্য এবং অন্যদের জন্য ফেতনার কারণ। তাই স্বামী বা পরিবারকর্তার উচিত নারীদেরকে সেসকল মারকাযে একাকী কিংবা শুধু ড্রাইভারের সঙ্গে না পাঠানো। বরং নিজেই তাদেরকে আনা-নেওয়া করা। কিংবা কোনো মাহরামকে দিয়ে আনা-নেওয়া করানো। পথের দূরত্ব কম হোক বা বেশি– যাই হোক।

৪. পরিবারের অভ্যন্তরে শিক্ষাকার্যক্রম চালু করা

আমাদের উচিত পরিবারের অভ্যন্তরে দাওয়াত পৌঁছানোর গতানুগতিক ও অনুকরণমূলক প্রতিবন্ধকতাগুলো ভেঙ্গে ফেলা। পরিবার-পরিজনের কানে যাবতীয় ইলম ও জ্ঞান একসঙ্গে ঢেলে দেওয়ার পরিবর্তে পরিবারকর্তার উচিত নতুন, আধুনিক ও বৈচিত্রময় বিভিন্ন মাধ্যমে তাদের কাছে মূল বার্তাটি পৌঁছে দেওয়া।

এ হিসেবে পরিবারের অভ্যন্তরে শিক্ষাবিষয়ক বিভিন্ন কার্যক্রম চালু করা যেতে পারে। সেখানে প্রতিযোগিতা, ঘটনা বর্ণনা, গল্প, বৈধ খেলাধুলাসহ এমন অনেক কিছুই থাকতে পারে, যা একইসাথে তাদের শিক্ষা ও মানসিকতা গঠনের মাধ্যম হবে, পাশাপাশি তারা তাতে আনন্দ ও বিনোদনের ছোঁয়াও পাবে।

এ সকল কার্যক্রম ও প্রোগ্রামের মাধ্যমে পরিবারকর্তা আল্লাহ ﷻ-র নিম্নোক্ত আদেশ বাস্তবায়নেই ব্রতী হবেন, যেখানে তিনি ইরশাদ করেছেন–

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾

হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে [জাহান্নামের] আগুন থেকে রক্ষা কর। [তাহরীম : ৬]

কোনো পরিবারকর্তা এসব কার্যক্রম ও উদ্যোগ বাস্তবায়ন করে এ কথা ভাববেন না যে, এর মাধ্যমে তিনি সময় নষ্ট করছেন। বরং এটা নিজ পরিবার-পরিজনকে জাহান্নাম থেকে রক্ষারই একটি প্রচেষ্টা। কেননা, আশা করা যায়, এ শিক্ষাকার্যক্রমের মাধ্যমে তিনি পরিবার-পরিজনকে ধীরে ধীরে টেলিভিশন ডিশ ইত্যাদি থেকে বিমুখ করতে পারবেন। নাটক, সিনেমা-সিরিয়াল ও কার্টুন থেকে ফেরাতে পারবেন।

৫. ঘটনা বলে শিশুদের তারবিয়াত করা

শিশুদের কাছে কাঙ্ক্ষিত বার্তা পৌঁছানোর উপকারী একটি মাধ্যম হচ্ছে ঘটনা বা গল্পের ছলে বিষয়টি উপস্থাপন করা। এটা প্রমাণিত ও পরীক্ষিত– বয়সভেদে শিশুদের উপর ঘটনার প্রভাব পড়ে অত্যন্ত গভীরভাবে। যা সাধারণত অন্য কোনোভাবে সম্ভব হয় না।

তবে যে ঘটনা বলে আমরা আমাদের সন্তানদের তারিবয়াত করার কথা বলছি, তা অবশ্যই হতে হবে ইসলামী ঘটনাবলি। আমাদের পবিত্র কুরআন, প্রিয় নবীজী ﷺ-র সুন্নাত ও হাদীস ভাণ্ডার এবং আমাদের সুবৃহৎ ইতিহাসভাণ্ডার এমনসব অসংখ্য ঘটনায় পরিপূর্ণ, যা ওয়াজ-নসীহত ও উপদেশ এবং বিভিন্ন ফায়দা ও হেকমতে পূর্ণ।

এখানে আমরা নমুনাস্বরূপ কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করে দিচ্ছি। যেমন–

ঘটনা– ১ :

উটের ঘটনা। যে উট নবীজী ﷺ-র কাছে মালিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিল– মালিক তাকে ক্ষুধার্ত রেখে কষ্ট দেয় এবং অধিক পরিমাণে কাজ করিয়ে ক্লান্ত-শ্রান্ত করে দেয়।

আবদুল্লাহ ইবনে জাফর رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন নবীজী ﷺ আমাকে তাঁর খচ্চরের পিছনে বসালেন। অতঃপর গোপন কিছু কথা বলে এ মর্মে আমাকে সতর্ক করে দিলেন, যেন আমি তা কাউকে না বলি।

... অতঃপর নবীজী ﷺ এক আনসারীর খেজুর বাগানে প্রবেশ করলেন। হঠাৎ একটি উট তাঁর দৃষ্টিগোচর হয়। উটটি নবীজী ﷺ-কে দেখে কাঁদতে শুরু করে এবং তার চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে থাকে।

নবীজী ﷺ উটটির কাছে গিয়ে তার মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করলেন। এতে উটটি কান্না থামাল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এ উটের মালিক কে? তিনি আবারও ডাকলেন, উটটি কার?

এক আনসারী যুবক এগিয়ে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটি আমার। নবীজী ﷺ বললেন, আল্লাহ যে তোমাকে এই নিরীহ প্রাণীটির মালিক বানিয়েছেন, এর অধিকারের ব্যাপারে তুমি কি আল্লাহ ﷻ-কে ভয় কর না? উটটি আমার কাছে অভিযোগ করেছে– তুমি একে ক্ষুধার্ত রাখো এবং একে কষ্ট দাও। [সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ২৫৪৯]

ঘটনা– ২ :

শয়তানের সাথে আবু হুরায়রা رضي الله عنه-র ঘটনা।

আবু হুরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে এক রামযানে যাকাতের মাল হেফাজতের দায়িত্বে নিযুক্ত করলেন। এক রাতের ঘটনা। এক ব্যক্তি এসে অঞ্জলি ভরে খাদ্যসামগ্রী নিয়ে যেতে লাগল। আমি তাকে পাকড়াও করে ফেললাম এবং বললাম, আল্লাহর কসম! আমি তোমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-র কাছে নিয়ে যাব। সে বলল, আমাকে ছেড়ে দিন। আমি খুবই অভাবগ্রস্ত; আমার যিম্মায় পরিবারের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব রয়েছে এবং আমার প্রয়োজন তীব্র।

আবু হুরায়রা رضي الله عنه বলেন, [তার অনুনয়-বিনয় ও কাকুতি-মিনতি দেখে দয়াপরবশ হয়ে] আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। সকালে নবীজী ﷺ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আবু হুরায়রা! তোমার রাতের বন্দীর কী করলে?

আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে তার তীব্র অভাব ও পরিবার-পরিজনের কথা বলায় তার প্রতি আমার দয়া হয়। তাই আমি তাকে ছেড়ে দিয়েছি। নবীজী ﷺ বললেন, সাবধান! সে তোমার কাছে মিথ্যা বলেছে এবং সে আবার আসবে।

[আবু হুরায়রা رضي الله عنه বলেন] 'সে আবার আসবে'– রাসূলুল্লাহ ﷺ-র এ কথার কারণে আমি নিশ্চিত বুঝতে পারলাম, সে পুনরায় আসবে। কাজেই আমি তার অপেক্ষায় থাকলাম। [পরদিন রাতে] সে আবার এল এবং অঞ্জলি ভরে খাদ্যসামগ্রী নিয়ে যেতে লাগল। আমি তাকে আবারও ধরে ফেললাম এবং বললাম, আমি তোমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-র কাছে নিয়ে যাব। সে বলল, আমাকে ছেড়ে দিন। আমি খুবই দরিদ্র এবং আমার উপর পরিবার-পরিজনের দায়িত্ব ন্যস্ত। আমি আর আসব না।

[আবু হুররায়রা رضي الله عنه বলেন] তার প্রতি আমার দয়া হল এবং আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। সকাল হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আবু হুরায়রা! তোমার বন্দীর কী করলে?

আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে তার তীব্র প্রয়োজন ও পরিবার-পরিজনের কথা বলায় তার প্রতি আমার দয়া হয়। তাই আমি তাকে ছেড়ে দিয়েছি। নবীজী ﷺ বললেন, খবরদার! সে তোমার কাছে মিথ্যা বলেছে এবং সে আবার আসবে। [আবু হুররায়রা رضي الله عنه বলেন] তাই আমি তৃতীয়বার তার অপেক্ষায় থাকলাম।

[তৃতীয় রাতেও] সে এল এবং অঞ্জলি ভর্তি করে খাদ্যসামগ্রী নিয়ে যেতে লাগল। আমি তাকে এবারও পাকড়াও করলাম এবং বললাম, আমি তোমাকে অবশ্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ-র কাছে নিয়ে যাব। এ হল তিন বারের শেষ বার। তুমি প্রত্যেকবার বল আর আসবে না, কিন্তু আবার আস।

সে বলল, [শেষ বারের মতো] আমাকে ছেড়ে দিন। আমি আপনাকে কয়েকটি কথা শিখিয়ে দিব; যা দিয়ে আল্লাহ ﷻ আপনাকে উপকৃত

করবেন। আমি বললাম, সেটা কী? সে বলল, যখন আপনি রাতে শুতে যাবেন, তখন আয়াতুল কুরসী পাঠ করবেন। তা হলে আল্লাহ ﷻ-র পক্ষ থেকে আপনার জন্য একজন রক্ষক নিযুক্ত করা হবে এবং ভোর পর্যন্ত শয়তান আপনার কাছে আসতে পারবে না। [আবু হুররায়রা رضي الله عنه বলেন] কাজেই আমি তাকে ছেড়ে দিলাম।

ভোর হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, আবু হুরায়রা! গত রাতে তোমার বন্দী কী করল? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! সে আমাকে বলল– সে আমাকে কয়েকটি কথা শিখিয়ে দিবে, যা দিয়ে আল্লাহ ﷻ আমাকে লাভবান করবেন। তাই আমি তাকে ছেড়ে দিয়েছি। তখন নবীজী ﷺ আমাকে বললেন, ওই কথাগুলো কী? আমি বললাম, সে আমাকে বলেছে, যখন আপনি আপনার বিছানায় শুতে যাবেন, তখন আয়াতুল কুরসী পাঠ করবেন। অতঃপর সে আমাকে বলল, এতে আল্লাহ ﷻ-র পক্ষ থেকে আপনার জন্য একজন রক্ষক নিযুক্ত থাকবে এবং ভোর পর্যন্ত আপনার কাছে শয়তান আসতে পারবে না। সাহাবায়ে কেরাম رضي الله عنهم আজমাইন কল্যাণের জন্য আগ্রহী ছিলেন। নবীজী ﷺ বললেন, হ্যাঁ, এ কথাটি তো সে তোমাকে সত্যই বলেছে, কিন্তু সাবধান! সে মিথ্যুক। হে আবু হুরায়রা! তুমি কি জান, তিন রাত ধরে তুমি কার সাথে কথাবার্তা বলছিলে? আবু হুরায়রা رضي الله عنه বললেন, জি না। নবীজী ﷺ বললেন, সে ছিল শয়তান। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩২৭৫]

ঘটনা– ৩ :

পাখির ছানার ঘটনা।

আল খুদ্র গোত্রের তীরন্দায আমের رضي الله عنه থেকে বর্ণিত দীর্ঘ হাদীসের এক পর্যায়ে তিনি বলেন, ...নবীজী ﷺ তখন একটি গাছের নীচে তাঁর জন্য বিছানো একটি কম্বলের উপর বসা ছিলেন। তাঁর চার পাশে তাঁর সাহাবীগণও বসা ছিলেন। আমি তাঁদের কাছে বসলাম। [নবীজী ﷺ

বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করছিলেন] ...এমতাবস্থায় তাঁর কাছে এক ব্যক্তি এল। আগন্তুকের গায়ে কম্বল জড়ানো এবং তার হাতে কিছু একটা ছিল। সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনাকে দেখতে পেয়েই আপনার কাছে উপস্থিত হলাম। গাছপালার মধ্য দিয়ে পথ অতিক্রম করার সময় আমি পাখির বাচ্চার আওয়াজ শুনতে পাই। আমি সেগুলো ধরে আমার কম্বলের মধ্যে রাখি।

বাচ্চাগুলোর মা এসে আমার মাথার উপর চক্কর দিতে লাগল। আমি বাচ্চাগুলোকে তাদের মায়ের জন্য কম্বলের মধ্য থেকে বের করে দিলাম। ফলে পাখিটি এসে বাচ্চাগুলোর সাথে মিলিত হল। আমি সবগুলোকে আবার আমার কম্বম দিয়ে লেপটিয়ে ধরে ফেললাম। এখন সবগুলো পাখি আমার সাথে আছে।

নবীজী ﷺ বললেন, সেগুলো বের কর। সুতরাং, সে বের করল। কিন্তু মা পাখিটা বাচ্চাদের রেখে যেতে চাইল না। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাহাবীদের বললেন, বাচ্চাদের প্রতি মা পাখিটার মায়ায় তোমরা কি আশ্চর্যবোধ করছ না?! তাঁরা বললেন, হাঁ ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন, সেই সত্তার শপথ, যিনি আমাকে সত্য দ্বীনসহ পাঠিয়েছেন! বাচ্চাদের প্রতি মা পাখিটার যে মায়া রয়েছে, আল্লাহ ﷻ অবশ্যই তাঁর বান্দাদের প্রতি আরও অধিক মমতাময়। তুমি যেখান থেকে বাচ্চাগুলো ধরে এনেছ, মা-সহ তাদেরকে সেখানে রেখে আসো। সুতরাং, সে পাখিগুলো সেখানে রেখে এল। [সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ৩০৮৯]

ঘটনা– ৪ :

আবদুল্লাহ ইবনে উমর رضي الله عنهما ও রাখালের ঘটনা।

আবদুল্লাহ ইবনে উমর رضي الله عنهما এক সফরে পথিমধ্যে দেখতে পেলেন এক রাখাল বকরি চড়াচ্ছে। তিনি রাখালের আমানতদারি ও বিশ্বস্ততা পরীক্ষা করতে চাইলেন। তাই এগিয়ে গিয়ে রাখালকে বললেন,

আমাকে কিছু দুধ দিবে? রাখাল জওয়াব দিল, এ বকরিগুলো আমার নয়। আবদুল্লাহ ইবনে উমর ﷺ বললেন, তা হলে এখান থেকে একটি বকরি আমার কাছে বিক্রি করে দাও। তবে আমি আমার নিজের বকরি থেকে দুধ গ্রহণ করব। রাখাল বলল, আমি আমার মালিককে এই বকরি সম্পর্কে কী জওয়াব দিব? ইবনে উমর ﷺ বললেন, তুমি তোমার মালিককে বলবে– একটি বকরি বাঘে খেয়ে ফেলেছে। এমন তো অহরহই হয়ে থাকে। রাখাল বলল, তা হলে আল্লাহ ﷻ তখন কোথায় থাকবেন? [আল্লাহ ﷻ কি দেখবেন না?!]

রাখালের মুখে এ কথা শুনে ইবনে উমর ﷺ বললেন, আল্লাহর কসম! 'আল্লাহ ﷻ তখন কোথায় থাকবেন?'– এ কথা বলার আমি অধিক হকদার। এরপর তিনি ওই রাখাল ও সমস্ত বকরি মালিকের কাছ থেকে কিনে নিলেন। অতঃপর রাখালকে আযাদ করে দিয়ে সমস্ত বকরি তাকে দিয়ে দিলেন। [আল মু'জামুল কাবীর লিত-ত্ববরানী, হাদীস নং ১৩০৫৪]

ঘটনা– ৫ :

উমর ﷺ ও দুধ বিক্রেতা মা-মেয়ের ঘটনা।

উমর ﷺ-র খেলাফতকালের ঘটনা। এক রাতে তিনি প্রজাদের হাল-হাকিকত ও অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য ছদ্মবেশে বিভিন্ন এলাকায়, রাস্তা-ঘাটে হাঁটছিলেন। হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ এক ঘর থেকে এক মা ও মেয়ের কথোপকথনের আওয়াজ শুনতে পেলেন। উমর ﷺ দাঁড়িয়ে গেলেন। শুনতে লাগলেন মা ও মেয়ের কথোপকথন। তিনি শুনছেন– মা মেয়েকে বলছেন, দুধে পানি মেশাও।

মেয়ে উত্তর দিল, মা! খলীফা উমর দুধে পানি মেশাতে নিষেধ করেছেন।

মা বললেন, খলীফা উমর তো এখন দেখছেন না!

মেয়ে বলল, মা! খলীফা উমর দেখছেন না; কিন্তু উমরের আল্লাহ ﷻ তো দেখছেন!

উমর رضي الله عنه আড়াল থেকে মা-মেয়ের কথোপকথন শুনে চিহ্নস্বরূপ তাদের ঘরের পিছনে একটি দাগ টেনে চলে এলেন। পরদিন খলীফা উমর লোক মারফত মা-মেয়েকে দরবারে ডেকে পাঠালেন।

মা-মেয়ে দরবারে এসে উপস্থিত হলে উমর رضي الله عنه জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি এ কথাগুলো বলেছেন?

মা উত্তর দিলেন, জি হাঁ।

উমর رضي الله عنه বললেন, আপনার মেয়ে কি এই উত্তর দিয়েছিল?

মা এবারও বললেন, জি হাঁ।

উমর رضي الله عنه জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার মেয়ের কি বিয়ে হয়েছে?

মা উত্তর দিলেন, জি না।

উমর رضي الله عنه বললেন, আপনি সম্মত হলে আপনার মেয়েকে আমার ছেলে আবদুল্লাহর সাথে বিয়ে দিতে চাচ্ছি।

মা রাজি হলেন। মেয়েটি খলীফাতুল মুসলিমীন উমর رضي الله عنه-র সুযোগ্য ছেলে আবদুল্লাহ رضي الله عنه-র স্ত্রী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করল। [তারীখে দিমাশ্‌ক– ৭০/২৫৩]

ঘটনা– ৬ :

জাদুকর, ধর্মযাজক ও বালকের ঘটনা।

সুহাইব رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, তোমাদের পূর্ববর্তী যামানায় এক বাদশাহ ছিল। তার ছিল এক জাদুকর। বার্ধক্যে পৌঁছে সে বাদশাহকে বলল, আমি তো বৃদ্ধ হয়ে পড়েছি, সুতরাং একজন বালককে আপনি আমার কাছে প্রেরণ

করুন, যাকে আমি জাদুবিদ্যা শিক্ষা দিব। অতঃপর জাদুবিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার জন্য বাদশাহ তার কাছে এক বালককে প্রেরণ করল।

বালকের যাত্রাপথে ছিল এক ধর্মযাজক। বালক একদিন তার কাছে বসল এবং তার কথা শুনল। ধর্মযাজকের কথা বালকের পছন্দ হল। তারপর বালক জাদুকরের কাছে যাত্রাকালে সর্বদাই ধর্মযাজকের কাছে যেত এবং তার নিকট বসত। এরপর সে যখন জাদুকরের কাছে যেত, তখন জাদুকর তাকে মারধর করত। ফলে জাদুকরের ব্যাপারে বালক ধর্মযাজকের কাছে অভিযোগ করল। তখন ধর্মযাজক বলল, তোমার যদি জাদুকরের ব্যাপারে ভয় হয়, তা হলে বলবে, আমার পরিবারের লোকেরা আমাকে আসতে দেয়নি। আর যদি তুমি তোমার গৃহকর্তার ব্যাপারে আশঙ্কা বোধ কর, তা হলে বলবে, জাদুকর আমাকে বিলম্বে ছুটি দিয়েছে।

এমনিভাবে চলতে থাকাবস্থায় একদিন হঠাৎ বালক পথিমধ্যে একটি ভয়ানক হিংস্র প্রাণীর সম্মুখীন হল, যা লোকদের পথ আটকে রেখেছিল। এ অবস্থা দেখে বালক বলল, আজই জানতে পারব, জাদুকর উত্তম না ধর্মযাজক উত্তম। অতঃপর একটি পাথর হাতে নিয়ে সে বলল, হে আল্লাহ! যদি জাদুকরের চাইতে ধর্মযাজক আপনার কাছে পছন্দনীয় হয়, তা হলে এ পাথরের আঘাতে এ হিংস্র প্রাণীটি নিঃশেষ করে দিন, যেন মানুষজন চলাচল করতে পারে। অতঃপর বালক প্রাণীটির প্রতি তার হাতের পাথর ছুড়ে মারল এবং সেটাকে মেরে ফেলল। ফলে লোকজন আবার যাতায়াত করতে শুরু করল।

এরপর সে ধর্মযাজকের কাছে এসে সম্পূর্ণ ঘটনা খুলে বলল। ধর্মযাজক বলল, বৎস! আজ তুমি আমার থেকেও শ্রেষ্ঠ। তোমার মর্যাদা এ পর্যন্ত পৌঁছেছে যা আমি দেখতে পাচ্ছি। তবে শীঘ্রই তুমি পরীক্ষার সম্মুখীন হবে। যদি পরীক্ষার মুখোমুখি হও, তবে আমার কথা গোপন রাখবে।

এদিকে বালক আল্লাহ ﷻ-র হুকুমে জন্মান্ধ ও কুষ্ঠরোগীকে আরোগ্য দান করতে লাগল এবং লোকদের যাবতীয় ব্যাধির নিরাময় করতে লাগল। বাদশাহর পরিষদবর্গের এক লোক অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তার সংবাদ শুনতে পেয়ে বহু হাদিয়া-উপঢৌকন নিয়ে বালকের কাছে এল এবং তাকে বলল, তুমি যদি আমাকে আরোগ্য দান করতে পার, তবে এসব মাল আমি তোমাকে দিয়ে দিব। এ কথা শুনে বালক বলল, আমি তো কাউকে আরোগ্য দান করতে পারি না। আরোগ্য তো দান করেন আল্লাহ ﷻ। তুমি যদি আল্লাহ ﷻ-র উপর ঈমান আন, তবে আমি আল্লাহ ﷻ-র কাছে দোয়া করব, আল্লাহ ﷻ তোমাকে আরোগ্য দান করবেন।

তারপর সে আল্লাহ ﷻ-র উপর ঈমান আনল। আল্লাহ ﷻ তাকে রোগমুক্ত করে দিলেন। এরপর সে বাদশাহর কাছে এসে অন্যান্য দিনের মতো এবারও বসল। বাদশাহ তাকে প্রশ্ন করল, কে তোমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছে? সে বলল, আমার পালনকর্তা। এ কথা শুনে বাদশাহ তাকে আবার প্রশ্ন করল, আমি ছাড়া তোমার অন্যকোনো পালনকর্তাও আছে কি? সে বলল, আমার ও আপনার সকলের প্রতিপালক মহান আল্লাহ ﷻ।

এ কথা শুনে বাদশাহ তাকে পাকড়াও করে অবিরতভাবে শাস্তি দিতে লাগল। অবশেষে সে ওই বালকের সন্ধান দিল। অতঃপর বালককে নিয়ে আসা হল। বাদশাহ তাকে বলল, হে প্রিয় বৎস! তোমার জাদু এ পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে, তুমি অন্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকেও নিরাময় করতে পার! বালক বলল, আমি কাউকে নিরাময় করতে পারি না। নিরাময় করেন আল্লাহ ﷻ। এ কথা বলার কারণে বাদশাহ তাকে শাস্তি দিতে লাগল। অবশেষে সে ধর্মযাজকের কথা বলে দিল। এরপর ধর্মযাজককে ধরে আনা হল এবং তাকে বলা হল– তুমি তোমার দ্বীন থেকে ফিরে এসো।

ধর্মযাজক তা অস্বীকার করল। ফলে তার মাথার তালুতে করাত রেখে মাথাকে টুকরো টুকরো করে ফেলা হল। অবশেষে আনা হল ওই

বালককে এবং তাকেও বলা হল– তুমি তোমার দ্বীন থেকে ফিরে এসো। বালকও অস্বীকার করল। অতঃপর বাদশাহ বালককে তার কিছু সহচরের হাতে অর্পণ করে বলল, তোমরা তাকে অমুক পাহাড়ে নিয়ে যাও এবং তাকেসহ পাহাড়ে আরোহণ কর। পর্বতশৃঙ্গে পৌঁছার পর সে যদি তার ধর্ম থেকে ফিরে আসে, তা হলে তো ভালো। নতুবা তাকে সেখান থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিবে।

বাদশাহর আদেশ অনুযায়ী তারা তাকে সেখানে নিয়ে গেল এবং তাকেসহ পর্বতে আরোহণ করল। তখন বালক দোয়া করে বলল, হে আল্লাহ! তোমার যেভাবে ইচ্ছা আমাকে তাদের ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা কর। তৎক্ষণাৎ তাদেরসহ পাহাড় কেঁপে উলঠ। ফলে তারা পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়ল। আর বালক হেঁটে হেঁটে বাদশাহর কাছে চলে এল। এ দেখে বাদশাহ তাকে প্রশ্ন করল, তোমার সাথিরা কোথায়? সে বলল, আল্লাহ ﷻ আমাকে তাদের চক্রান্ত থেকে রক্ষা করেছেন।

বাদশাহ আবারও তাকে তার কতিপয় সহচরের হাতে সমর্পণ করে বলল, তোমরা তাকে নিয়ে যাও এবং নৌকায় উঠিয়ে মাঝ-সমুদ্রে চলে যাও। অতঃপর সে যদি তার দ্বীন থেকে ফিরে আসে, তা হলে তো ভালো। নতুবা তোমরা তাকে সমুদ্রে ফেলে দিয়ো। বাদশাহর আদেশ মোতাবেক তারা তাকে সমুদ্রে নিয়ে গেল। এবারও বালক দোয়া করে বলল, হে আল্লাহ! তোমার যেভাবে ইচ্ছা তুমি আমাকে তাদের চক্রান্ত থেকে রক্ষা কর। তৎক্ষণাৎ নৌকাটি তাদেরসহ উল্টে গেল। ফলে তারা সকলেই পানিতে ডুবে গেল। আর বালক হেঁটে হেঁটে বাদশাহর কাছে চলে এল।

এ দেখে বাদশাহ আবার তাকে প্রশ্ন করল, তোমার সঙ্গীগণ কোথায়? বালক বলল, আল্লাহ ﷻ আমাকে তাদের ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা করেছেন। অতঃপর বালক বাদশাহকে বলল, তুমি আমাকে ততক্ষণ পর্যন্ত হত্যা করতে পারবে না, যতক্ষণ না তুমি আমার নির্দেশিত পথ অবলম্বন করবে। বাদশাহ বলল, সে আবার কী? বালক বলল, একটি

ময়দানে তুমি লোকদের জমায়েত কর। অতঃপর একটি কাঠের শূলিতে আমাকে উঠিয়ে আমার তীরদানি থেকে একটি তীর নিয়ে সেটাকে ধনুকের মাঝে রেখে بِسْمِ اللّٰهِ رَبِّ الْغُلَامِ [এ বালকের প্রভু আল্লাহর নামে] বলে আমার দিকে তীর নিক্ষেপ কর। এ পন্থা অবলম্বন করলে তুমি আমাকে হত্যা করতে পারবে।

বালকের কথা অনুসারে বাদশাহ লোকদের এক মাঠে জমায়েত করল এবং তাকে একটি কাঠের শূলিতে চড়াল। অতঃপর তার তীরদানি থেকে একটি তীর নিয়ে সেটাকে ধনুকের মাঝে রেখে بِسْمِ اللّٰهِ رَبِّ الْغُلَامِ [এ বালকের প্রভু আল্লাহর নামে] বলে তার দিকে তা নিক্ষেপ করল। তীরটি বালকের কানের নিম্নাংশে গিয়ে বিঁধল। অতঃপর সে তীরবিদ্ধ স্থানে নিজের হাত রাখল এবং সাথে সাথে প্রাণ ত্যাগ করল। এ দৃশ্য দেখে রাজ্যের লোকজন বলে উঠল– آمَنَّا بِرَبِّ الْغُلَامِ آمَنَّا بِرَبِّ الْغُلَامِ [আমরা এ বালকের পালনকর্তার উপর ঈমান আনলাম; আমরা এ বালকের পালনকর্তার উপর ঈমান আনলাম]

এ সংবাদ বাদশাহকে জানানো হল এবং তাকে বলা হল, লক্ষ করেছেন কি, আপনি যে পরিস্থিতির আশঙ্কা করছিলেন, আল্লাহর শপথ! সে আশঙ্কাজনক পরিস্থিতিই আপনার মাথার উপর চেপে বসেছে। সকল মানুষই বালকের পালনকর্তার উপর ঈমান এনে ফেলেছে।

এ দেখে বাদশাহ সকল রাস্তার মাথায় গর্ত খননের নির্দেশ দিল। গর্ত খনন করা হল এবং ওগুলোতে আগুন জ্বালানো হল। অতঃপর বাদশাহ আদেশ করল– যে লোক তার ধর্মমত বর্জন না করবে, তাকে ওগুলোতে নিক্ষেপ করবে। লোকেরা তা-ই করল। পরিশেষে এক মহিলা একটি শিশু নিয়ে অগ্নিগহ্বরে পতিত হওয়ার ব্যাপারে ইতস্তত করছিল। এ দেখে দুধের শিশু তাকে [তার মাকে] বলল, ওহে আম্মাজান! সবর করুন, আপনি তো সত্য দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত আছেন। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩০০৫]

এ ছাড়াও এমন আরও অনেক ঘটনা আছে, যেগুলো পিতা সুন্দরভাবে হৃদয়গ্রাহী করে সন্তানের সামনে উপস্থাপন করতে পারলে তাদের মাঝে এর গভীর প্রভাব লক্ষ করতে পারবেন। এভাবে তিনি তাদের মাঝে উত্তম আখলাক সৃষ্টি ও উৎকৃষ্ট গুণাবলির বীজ বপন করতে পারবেন।

তবে এসকল ঘটনা শিশুদের সামনে উপস্থাপনের সময় লক্ষ রাখতে হবে– ঘটনা যেন মাত্রাতিরিক্ত লম্বা না হয়ে যায়। তা ছাড়া এমন কোনো শব্দ ব্যবহার করা যাবে না, যা শিশুদের বুঝতে অসুবিধা হয়। ঘটনার যে অংশ তারা বুঝবে না, তা উহ্য রাখতে হবে। তদ্রূপ তাদের সামনে অনর্থক, অহেতুক ও বাজে ঘটনা বর্ণনা করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের কথা হচ্ছে, এ ধরনের অনর্থক, অহেতুক ও বাজে গল্পের বইয়ে আমাদের বাজার ছেয়ে গেছে। আরও বিপদের কথা হচ্ছে, সেসকল ঘটনার কোনো কোনোটি আমাদের শিশুদের মানসিকতায় অনেক ভ্রান্ত ধারণা ও শরীয়তবিরোধী বিশ্বাসের জন্ম দিয়ে থাকে। পাঠকের বোঝার সুবিধার্থে এখানে আমি একটি উদাহরণ দিয়ে দিচ্ছি। একবার আমি রেডিও'র চ্যানেল ঘুরাচ্ছিলাম। হঠাৎ ছোটদের একটি ঘটনা আমার মনোযোগ আকর্ষণ করল। ঘটনাটি উপস্থাপন করছিল এক বেতার ঘোষিকা।

ঘোষিকা বলছিল– পিঁপড়া একটি পরিশ্রমী প্রাণী। সে তার খাবার সংগ্রহ করে এবং সঞ্চয় করে ঘরে রেখে দেয়। আর তেলাপোকা একটি অলস প্রাণী। সে তার খাবার সংগ্রহও করে না, সঞ্চয়ও করে না। বরং ইতস্তত ফেলে রাখে ও নষ্ট করে ফেলে। তার কোনো কাজেই সে যত্নশীল ও মনোযোগী নয়।

কিছুদিন পরই এল শীতকাল। শীতকালে পিঁপড়া খুব সুখেই দিন কাটাতে লাগত। কারণ, তার ঘরে খাবার সঞ্চয় করা আছে। কিন্তু তেলাপোকা পড়ে গেল বিপদে। কারণ, তার ঘরে কোনো খাবার সঞ্চয়

করা নেই। শেষে আর কুলোতে না পেরে একদিন তেলাপোকা ক্ষুধার্ত অবস্থায় তার ঘর থেকে বের হল। কড়া নাড়ল প্রতিবেশী পিঁপড়ার ঘরে।

ঘটনার এ পর্যায়ে এসে ঘোষিকা তার কণ্ঠস্বরের জাদু কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিয়ে তেলাপোকার ভাষ্য উপস্থাপন করল এভাবে– ভাই! আমাকে কিছু খাবার ঋণ দাও। সামনের বছর আমি তোমার পাওনা পরিশোধ করে দিব অতিরিক্ত মুনাফাসহ।

প্রিয় পাঠক!

ঘোষিকা গল্প বলছে– তেলাপোকা পিঁপড়া থেকে ঋণ গ্রহণ করছে। সে ঋণ সামনের বছর মুনাফাসহ ফিরিয়ে দিবে।

এ গল্প থেকে আমাদের কোমলমতি শিশুদের মনে কী ধারণা বদ্ধমূল হবে? তারা কি সুদের ধারণা ও শিক্ষা পাবে না?!

এরপর হঠাৎই আমরা আমাদের সন্তানদের ভ্রষ্টতা ও বিকৃতি নিয়ে হতভম্ব হয়ে পড়ি। পরস্পর বলাবলি করি– আমরা এমন কী করলাম? কোত্থেকে আমাদের সন্তানদের মাথায় এমন বিকৃত ও ভ্রষ্ট ধ্যান-ধারণার জন্ম হল? এ সমস্যার সূত্র কোথায়?

সমস্যার সূচনা সেটাই, যা আমাদের শিশুরা শুনে এবং দেখে। তারা দেখছে, শুনছে– তেলাপোকা পিঁপড়া থেকে ঋণ নিচ্ছে অতিরিক্ত মুনাফার বিনিময়ে– সুদে!

পরিবারকর্তার আদব, হক ও দায়িত্ব

পরিবারকর্তার উপর পরিবার-পরিজনের বিভিন্ন হক রয়েছে। যেমন, এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, নবীজী ﷺ যখন জানতে পারলেন আবদুল্লাহ ইবনে আমর رضي الله عنه প্রতিদিন সওম রাখেন, প্রতি রাতেই সারা রাত জেগে ইবাদত-বন্দেগী করেন, তখন নবীজী ﷺ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করে বললেন–

أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَقُومُ اللَّيْلَ وَتَصُومُ النَّهَارَ قُلْتُ إِنِّي أَفْعَلُ ذَلِكَ قَالَ فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ هَجَمَتْ عَيْنُكَ وَنَفِهَتْ نَفْسُكَ وَإِنَّ لِنَفْسِكَ حَقًّا وَلِأَهْلِكَ حَقًّا فَصُمْ وَأَفْطِرْ وَقُمْ وَنَمْ.

আমাকে কি জানানো হয়নি যে, তুমি রাতভর ইবাদতে জেগে থাক আর দিনভর সিয়াম পালন কর? [আবদুল্লাহ ইবনে আমর رضي الله عنه বলেন] আমি বললাম, হাঁ, আমি তা করে থাকি। তিনি ইরশাদ করলেন, এ কথা নিশ্চিত যে, তুমি এমন করতে থাকলে তোমার দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হয়ে যাবে এবং তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়বে। তোমার দেহের অধিকার রয়েছে, তোমার পরিবার-পরিজনেরও অধিকার রয়েছে। কাজেই তুমি সিয়াম পালন করবে এবং বাদও দেবে। আর জেগে ইবাদত করবে এবং ঘুমাবেও। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১১৫৩, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১১৫৯]

এই হাদীস স্পষ্টভাবে বর্ণনা করছে– আপনার উপর আপনার পরিবারের হক রয়েছে। অতএব, আপনাকে তাদের বিশেষভাবে সময় দিতে হবে। মনে রাখবেন, আপনি তাদের হক নষ্ট করলে তা

তাদেরকে ভ্রষ্টতা ও ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবে। কেননা, বহু পরিবারের ভ্রষ্টতা ও ধ্বংসের কারণসমূহের অন্যতম হচ্ছে– তাদের এ সকল হক নষ্ট করা।

সুতরাং, পরিবারের কর্তা যদি পরিবার রেখে সর্বদা অন্য কাজে ব্যস্ত থাকেন, পরিবারকে উপক্ষো করেন, তাদেরকে সময় না দেন, সঙ্গ না দেন, তাদের সঙ্গে ওঠাবসা না করেন, তা হলে কীভাবে তিনি তাদেরকে জানবেন? কীভাবে তাদেরকে সঠিক পথ দেখাবেন?

অতএব, দেখা যাচ্ছে– পরিবারের প্রাপ্য হক আদায় করা পরিবারকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করার অন্যতম মাধ্যম।

যেসব হকের ব্যাপারে সতর্ক থাকা উচিত

১. পরিবারের জন্য খরচ করা

একজন পরিবারকর্তা তার পরিবার-পরিজনের জন্য সম্পদ ব্যয় করতে আদিষ্ট। তাদের প্রয়োজনাদি পূরণ করতে দায়বদ্ধ। যাতে তাদের অন্যের হাতের দিকে তাকাতে না হয়। অন্যের সম্পদের প্রতি মুখাপেক্ষী হতে না হয়।

নবীজী ﷺ মুসলিম পুরুষদের আদেশ করেছেন অন্য যেকোনো ক্ষেত্রের আগে পরিবার-পরিজনের জন্য খরচ করতে। তিনি ইরশাদ করেছেন–

ابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ.

প্রথমে তাদেরকে দিবে, যাদের ভরণ-পোষণ তোমার দায়িত্বে। [বুখারী, হাদীস নং ৫৩৫৫, মুসলিম, হাদীস নং ১০৪২]

উমর رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبِيعُ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَيَحْبِسُ لِأَهْلِهِ قُوتَ سَنَتِهِمْ.

নবীজী ﷺ বনূ নাযীরের খেজুর বিক্রি করে ফেলতেন এবং পরিবারের জন্য এক বছরের খাদ্য রেখে দিতেন। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫০৪২]

বান্দার উপর দয়াময় আল্লাহ ﷻ-র অশেষ অনুগ্রহ ও মেহেরবানী যে, তিনি বান্দার পরিবার-পরিজনের জন্য খরচ করার বিনিময়ে মহা প্রতিদান প্রস্তুত করে রেখেছেন। এ খরচ করাকে তিনি সদকা ও সাওয়াবের মাধ্যম বলে সাব্যস্ত করেছেন– যদি বান্দা আল্লাহ ﷻ-র কাছে সাওয়াবের আশা রাখে। যেমন, হযরত আবু মাসউদ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত এক হাদীসে নবী কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন–

إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ.

> মানুষ স্বীয় পরিবার-পরিজনের জন্য সাওয়াবের আশায় যখন ব্যয় করে, তখন সেটা তার জন্য সদকা হিসেবে বিবেচিত হয়। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৫, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১০০২]

ইবনে হাজার আসকালানী رَحِمَهُ اللهُ বলেন, হাদীসে ব্যবহৃত শব্দ 'ইহতিসাব' অর্থ সাওয়াব ও প্রতিদান লাভের আশা রাখা। এ হাদীস থেকে বোঝা যায়, নিয়ত না থাকলে কোনো আমলের সাওয়াব পাওয়া যাবে না। আর তাই ইমাম বুখারী رَحِمَهُ اللهُ আবু মাসউদ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-র এই হাদীসটিকে 'আমলসমূহ নিয়ত ও সাওয়াবের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী' নামক অধ্যায়ের অধীনে এনেছেন।

হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ যে বলেছেন, 'স্বীয় পরিবার-পরিজনের জন্য'– এর মধ্যে স্ত্রী ও নিকটতম ব্যক্তিবর্গ অন্তর্ভুক্ত। কেননা, পরিবার-পরিজনের জন্য ব্যয় করা 'ইজমা' দ্বারা ওয়াজিব। তবে শরীয়ত একে 'সদকা' বলে উল্লেখ করেছে এই কারণে, যেন কেউ এ কথা মনে না করে যে, পরিবারের ভরণ-পোষণের বিনিময়ে কোনো সাওয়াব নেই। সবাই জানে সদকায় প্রতিদান আছে। অতএব, সকলেই বুঝতে পারবে, পরিবার-পরিজনের জন্য খরচ করলে তা সদকা হিসেবে বিবেচিত হবে এবং তার বিনিময়ে প্রতিদান ও সাওয়াব লাভ করবে। যাতে কেউ পরিবারের চাহিদা ও প্রয়োজন পূরণ করা ছাড়া অন্যদের জন্য সম্পদ ব্যয় না করে। অতএব, বোঝা গেল, পরিবারের জন্য খরচ করার বিষয়টি একদিকে ওয়াজিব হওয়া ও অপরদিকে শরীয়ত কর্তৃক একে

সদকা বলে উল্লেখ করার মাঝে কোনো বৈপরিত্য নেই। বরং তা [পরিবারের জন্য খরচ করা]-ই নফল সদকাসমূহের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম সদকা। [ফাতহুল বারী : ৯/৪৯৮]

একই মর্মে জাবের رضي الله عنه থেকেও একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, নবী কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন–

> اِبْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلأَهْلِكَ فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِى قَرَابَتِكَ فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِىْ قَرَابَتِكَ شَيْءٌ فَهَكَذَا وَهَكَذَا . يَقُولُ فَبَيْنَ يَدَيْكَ وَعَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ.
>
> [এ অর্থ] তুমি প্রথমে তোমার নিজের জন্য ব্যয় কর। তারপর যদি কিছু বাকি থাকে, তা হলে তোমার পরিবারের লোকদের জন্য ব্যয় কর। অতঃপর তোমার নিকটাত্মীয়দের জন্য ব্যয় কর। এরপরও যদি কিছু অবকাশ থাকে, তা হলে তা এদিক-সেদিক ব্যয় কর। এ বলে তিনি সামনে ডানে ও বামে হাত দিয়ে ইঙ্গিত করলেন। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৯৯৭]

তবে প্রিয় পাঠক! এর অর্থ এই নয় যে, আমরা অন্যান্য দান-সদকার কথা ভুলে যাব; অন্যকোনো ক্ষেত্রে দান করব না, খরচ করব না। বরং আমাদের দান-সদকার কিছু অংশ অন্যান্য ক্ষেত্রের জন্যও বরাদ্দ রাখা উচিত। বুদ্ধিমান লোক তিনিই, যিনি সকল ক্ষেত্রেই মধ্যম পন্থা অবলম্বন করেন। পরিবারের জন্য খরচের ক্ষেত্রে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করবেন; ভারসাম্য রক্ষা করবেন। কোনোরূপ অপচয়-অপব্যয় করবেন না। সম্পদের কিছু অংশ রেখে দিবেন কল্যাণ ও নেকের অন্যান্য ক্ষেত্রে ব্যয় করার জন্য।

২. শরয়ী আদব ও শিষ্টাচার রক্ষা করা

ইসলামী শরীয়ত পুরুষের জন্য পরিবারের ব্যাপারে বহু আদব ও শিষ্টাচার প্রণয়ন করেছে। সেসব শিষ্টাচার রক্ষা করে চলা আবশ্যক। উদাহরণস্বরূপ–

কোনো পুরুষ যখন স্ত্রী গমন করবে, তখন তার জন্য মা'ছুর দোয়া পড়া উচিত। যেমন, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﵄ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন–

لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ قَالَ بِاسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبْ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا فَقُضِيَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ لَمْ يَضُرُّهُ.

তোমাদের কেউ তার স্ত্রীর সাথে মিলনের পূর্বে যদি বলে– بِاسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبْ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا [আল্লাহর নামে শুরু করছি। হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে শয়তান থেকে দূরে রাখ এবং যা আমাদের দান করবে তাকেও শয়তান থেকে দূরে রাখ] তারপর [এ মিলনের মাধ্যমে] তাদের তাকদীরে কোনো সন্তান থাকলে শয়তান তার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। [বুখারী, হাদীস নং ১৪১, মুসলিম, হাদীস নং ১৪৩৪]

শরীয়তের পক্ষ থেকে স্ত্রীর একটি হক হচ্ছে– স্বামী দূরে কোথাও সফরে গেলে ফেরার সময় স্ত্রীকে পূর্ব-অবহিতকরণ ব্যতীত অতর্কিতে রাতের বেলায় তার ঘরের কড়া নাড়বে না। যেমন, হযরত জাবের ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন–

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ أَنْ يَطْرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ لَيْلاً.

রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো পুরুষকে রাতের বেলায় অতর্কিতে তার স্ত্রীর ঘরে ফিরতে নিষেধ করেছেন। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৮০১, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫০৭১, ভাষ্য মুসলিমের।]

অর্থাৎ কোনো পুরুষ যখন কোথাও সফরে যাবে এবং স্ত্রী থেকে দূরে থাকবে, অতঃপর সফর থেকে নিজ শহরে রাতের বেলায় ফিরে আসবে, তখন সে তাৎক্ষণিকভাবে রাতের বেলায় অতর্কিতে স্ত্রীর ঘরে গিয়ে হাজির হবে না। বরং প্রথমে কারও মাধ্যমে [কিংবা যেকোনো উপায়ে] স্ত্রীর কাছে তার আগমনের বার্তা পাঠাবে। যাতে স্ত্রী তাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারে এবং নিজেকে প্রস্তুত করে নিতে পারে।

যেমন, জাবের ইবনে আবদুল্লাহ ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন–

إِذَا دَخَلْتَ لَيْلًا فَلَا تَدْخُلْ عَلَى أَهْلِكَ حَتَّى تَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ وَتَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ.

সফর থেকে রাতে ফিরে এসে গৃহে প্রবেশ করবে না, যতক্ষণ না অনুপস্থিত স্বামীর স্ত্রী ক্ষৌরকার্য করে নিতে পারে এবং এলোকেশী স্ত্রী চিরুনি করে নিতে পারে। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪৯৪৮, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৭১৫]

অতএব, পরিবার যখন দেখবে, পুরুষ লোকটি শরয়ী আদব ও শিষ্টাচারের প্রতি অনুরাগী, তখন এটি তাদেরকেও শরয়ী আদবের প্রতি অনুরাগী ও যত্নশীল হতে উৎসাহিত করবে। আর এটি পরিবারকে জাহান্নাম থেকে রক্ষার অন্ততম্য গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকর একটি মাধ্যম।

৩. আমোদ-প্রমোদ ও হাস্য-রসিকতা করা

পরিবারের একটি হক হচ্ছে তাদের সঙ্গে আমোদ-প্রমোদ, হাস্য-রসিকতা ও বিনোদন করা।

যেমন, আয়েশা সিদ্দীকা ﵂ থেকে বর্ণিত এক হাদীসে তিনি বলেন–

كُنْتُ أَشْرَبُ وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ أُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ فَيَشْرَبُ وَأَتَعَرَّقُ الْعَرْقَ وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ أُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ.

আমি পানি পান করে সে পাত্র রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দিতাম। অথচ আমি তখন হায়েয অবস্থায় ছিলাম। আমার মুখ লাগানো স্থানে তিনি তার মুখ লাগিয়ে পানি পান করতেন। আমি হাড় থেকে গোশত কামড়ে খেতাম। তারপর তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দিতাম। অথচ আমি তখন হায়েয অবস্থায় ছিলাম। তিনি আমার মুখ লাগানো স্থানে তাঁর মুখ লাগাতেন। [মুসলিম, হাদীস নং ৩০০]

আয়েশা رضي الله عنها থেকে বর্ণিত অপর এক হাদীসে তিনি বলেন–

أَنَّهَا كَانَتْ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ قَالَتْ فَسَابَقْتُهُ فَسَبَقْتُهُ عَلَى رِجْلَيَّ فَلَمَّا حَمَلْتُ اللَّحْمَ سَابَقْتُهُ فَسَبَقَنِي فَقَالَ هَذِهِ بِتِلْكَ السَّبْقَةِ.

তিনি এক সফরে নবীজী ﷺ-র সাথে ছিলেন। তিনি বলেন, আমি তাঁর সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা করে তাঁর আগে চলে গেলাম। অতঃপর আমি মোটা হয়ে যাওয়ার পর তাঁর সাথে আবারও দৌড় প্রতিযোগিতা করলাম। এবার তিনি আমাকে পিছনে ফেলে দিলেন; বিজয়ী হয়ে গেলেন। তখন তিনি বললেন, এই বিজয় সেই বিজয়ের বদলা। [সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ২৫৭৮।

নবীজী ﷺ ছোটদের সঙ্গেও রসিকতা করতেন, কৌতুক করতেন। যেমন, আনাস رضي الله عنه থেকে বর্ণিত এক হাদীসে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যাইনাব বিনতে উম্মে সালামার সাথে হাস্য-রসিকতা করতেন। নবীজী তাকে দেখে বলতেন– 'হে যাইনাব! হে যুওয়াইনিব!' এভাবে একাধিকবার বলতেন। [আল মুখতারাহ লিয যিয়া : ২/৪৫]

আনাস ইবনে মালেক رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবীজী ﷺ একদিন উম্মে সুলাইমের ঘরে প্রবেশ করলেন। উম্মে সুলাইমের একটি ছেলে ছিল আবু তালহার ঔরস থেকে। তাকে আবু উমাইর বলে ডাকা হত। নবীজী ﷺ তার সাথে হাস্য-রসিকতা করতেন। সেদিন নবীজী ঘরে প্রবেশ করে দেখলেন, আবু উমাইর পেরেশান অবস্থায় বসে আছে। তখন নবীজী ﷺ বললেন, আবু উমাইরের কী হয়েছে, আমি তাকে পেরেশান দেখছি?! নবীজীকে জানানো হল, তার ছোট্ট পাখিটি মারা গেছে; যাকে নিয়ে সে খেলা করত। তিনি [আনাস رضي الله عنه] বলেন, এরপর নবীজী ﷺ বলতে লাগলেন– হে আবু উমাইর! কী করেছে [তোমার] নুগাইর [ছোট পাখি]? [মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ১২৯৮০]

[টীকা– এ হাদীসটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমেও আছে। মুসলিমের ভাষ্য এমন– আনাস ইবনে মালেক রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষের মাঝে চরিত্রগুণে সর্বোত্তম ছিলেন। আমার এক ভাই ছিল, যাকে আবু উমাইর বলে সম্বোধন করা হত। বর্ণনাকারী বলেন, আমি অনুমান করি, তিনি বলেছিলেন যে, সে দুধ ছাড়ানো বয়সের ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনই [আমাদের ঘরে] আসতেন, তখন তাকে দেখে বলতেন, হে আবু উমাইর! কী করেছে [তোমার] নুগাইর [চড়ুই]? এ কথা বলে তিনি তার সঙ্গে খেলা করতেন। –সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২১৫০]

এই হাদীসের ফায়দাসমূহ বর্ণনা করে একটি কিতাবই লিখে ফেলেছেন শাফেয়ী মাযহাবে বিখ্যাত ফকীহ ইবনুল কাস নামে প্রসিদ্ধ আল্লামা আবুল আব্বাস আহমাদ ইবনে আহমাদ আত-ত্বাবারী রহিমাহুল্লাহ। সেখানে তিনি এই হাদীসের ফায়দাসমূহের মধ্যে এ ফায়দাটির কথাও উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাথে [আবু উমাইরের সাথে] একটু বেশিই রসিকতা করতেন। কেননা, কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কাছে এলেই তার সঙ্গে রসিকতা করতেন।'

আমাদের এ আলোচনার উদ্দেশ্য এই নয় যে, একজন মানুষ সর্বাংশে কমেডিয়ান হয়ে যাবেন কিংবা হাস্য-রসিকতা ও কৌতুককে পেশা হিসেবে গ্রহণ করে নিবেন। এটা ভুল। কেননা, অতিমাত্রায় হাস্য-রসিকতা করা মানুষের কাছে ব্যক্তির গুরুত্ব ও গাম্ভীর্য কমিয়ে দেয়। মূল্য কমিয়ে দেয়। ঘরে, পরিবার-পরিজনের কাছে কদর কমিয়ে দেয়। তবে আমরা যেটা বলতে চাই, তা হচ্ছে– একজন মানুষ বাইরে যতটা সদালাপী ও হাস্য-রসিকতাকারী, ঘরে তিনি তার চেয়ে বেশি সদালাপী ও রসিকতাকারী হবেন।

অনেক সময় স্ত্রী রাগান্বিত হন, তখন যদি স্বামী তার সঙ্গে রসিকতা করেন, হাসি-মজাক করেন, তা হলে কিন্তু সহজেই সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। সংসারে শান্তি ও স্থিতি স্থায়ী হয়।

৪. পরিবারের সঙ্গে নৈশ আলাপ

নবীজী ﷺ রাতে ঘুমানোর পূর্বে পবিত্র স্ত্রীগণের সঙ্গো গল্প করতেন। যেমন, আয়েশা رضي الله عنها থেকে বর্ণিত এক হাদীসে তিনি ইরশাদ করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ [সফরকালে] রাতের বেলায় তাঁর সাথে [আয়েশা رضي الله عنها-র সাথে] একসঙ্গো সওয়ার হতেন এবং তাঁর সাথে কথা বলতে বলতে পথ চলতেন। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪৯১৩, সহীহ মুসিলম, হাদীস নং ২৪৪৫]

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস رضي الله عنهما রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, নবীজী ﷺ রাতের বেলায় ঘুমানোর পূর্বে কিছুক্ষণ তাঁর পরিবারের সঙ্গো কথাবার্তা বলতেন। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪৫৬৯, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৭৬৩]

এ থেকে উলামায়ে কেরাম রাতের বেলায় স্ত্রীর সঙ্গো স্বামীর নৈশ আলাপ ও গল্প করার বৈধতা প্রমাণ করেন। এমনকি ইমাম বুখারী رحمه الله তাঁর সহীহ বুখারীতে একটি অধ্যায়ই কায়েম করেছেন 'পরিবার-পরিজন ও মেহমানের সাথে রাতে কথাবার্তা বলা' নামে।

স্ত্রীদের সঙ্গো কথোপকথন ও নৈশ আলাপ নিঃসন্দেহে তাদের মনে আনন্দ জোগায়। তা ছাড়া এর মাধ্যমে তারা অনুভব করে যে, গৃহকর্তার কাছে তাদের কদর আছে। মনে রাখবেন, পুরুষরা যেমন নারীদের সঙ্গো কথাবার্তা বলতে আগ্রহী, তেমন নারীরাও পুরুষদের সঙ্গো কথাবার্তা বলায় আগ্রহী। অতএব, একজন পুরুষ যখন নিজ স্ত্রীর মানসিক চাহিদার এই দিকটিতে সাড়া দিবেন, তখন স্ত্রী আর অন্য কারও প্রতি মন দিবে না; কারও প্রতি মনোযোগী হবে না। আর এভাবেই একজন স্বামী জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষাকল্পে তার স্ত্রীর সামনে একটি প্রতিবন্ধকতা স্থাপন করে দিতে পারেন।

৫. বিনা প্রয়োজনে অধিকহারে দূরে না থাকা

ইসলামী শরীয়ত ব্যক্তির উপর তার পরিবারের যেসকল হক আরোপ করেছে, তার একটি হচ্ছে– কোনো কারণ ছাড়া দীর্ঘ সময় পরিবার থেকে দূরে না থাকা; কোনো প্রয়োজন ছাড়া তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন না থাকা। কেউ কোনো প্রয়োজনে সফরে গেলে, যখনই সফরের প্রয়োজন পুরা হয়ে যাবে, তখনই যেন সফর থেকে ফিরে আসে। আমাদের নবীজী ﷺ-র পক্ষ থেকে এমন আদেশই করা হয়েছে। যেমন, এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–

> اَلسَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنْ الْعَذَابِ يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَنَوْمَهُ فَإِذَا قَضَى نَهْمَتَهُ فَلْيُعَجِّلْ إِلَى أَهْلِهِ.
>
> সফর আযাবের অংশ বিশেষ। তা তোমাদের যথাসময় পানাহার ও নিদ্রায় বাধা সৃষ্টি করে। তাই প্রত্যেকেই যেন নিজের প্রয়োজন মিটিয়ে অবিলম্বে আপন পরিজনের কাছে ফিরে আসে। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৭১০, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৯২৭]

এই হাদীস বিনা প্রয়োজনে পরিবার-পরিজন থেকে দূরে থাকা ও প্রবাসে থাকার অপছন্দনীয়তা প্রামণ করে। কারণ, একজন পুরুষ সফরে থাকাকালীন তার স্ত্রী-পরিজন ও সন্তানাদি কষ্টে থাকার বিষয়টি একেবারেই স্পষ্ট।

ইমামুল হারামাইন যখন তাঁর পিতার স্থলাভিষিক্ত হলেন, তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল– 'কেন সফর আযাবের একটা অংশ?', তখন তিনি তাৎক্ষণিকভাবে জওয়াব দিয়েছিলেন– 'কেননা, তাতে রয়েছে আপনজনদের বিচ্ছেদ-বিরহ।'

পরিবার-পরিজন ও সন্তানাদির পাশে পিতার বসা, তাদের সঙ্গো সময় কাটানো, তাদের প্রতি আদর-স্নেহ-ভালোবাসা ও সহানুভূতি প্রকাশ করা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেননা, এতে করে তাদের

মানসিক ও সহজাত আগ্রহের প্রতি সাড়া দেওয়া হয়। তাদের প্রতি যথাযথ কদর ও মর্যাদার বহিঃপ্রকাশ ঘটানো হয়।

অনেক দাঈ –আল্লাহ ﷻ তাদের সঠিক বুঝ দান করুন– দাওয়াতের পক্ষে যুক্তি পেশ করে স্ত্রী-পরিজন ও সন্তানাদিকে ফেলে রেখে দীর্ঘ সময়ের জন্য সফরে বের হয়ে যান।

অনেক মানুষ দুনিয়াবী বিভিন্ন কাজে পরিবার থেকে দূরে থাকেন। অনেকে এমন সফরেও বের হন, যে সফরের কোনো প্রয়োজন নেই। এমনকি তার উপযুক্ত বিকল্পও আছে। প্রকৃতপক্ষে এ ধরনের সফর ও পরিবার থেকে দূরে থাকা নিঃসন্দেহে বিভিন্ন সংকট, সমস্যা ও জটিলতার সৃষ্টি করে। পিতা ও সন্তানাদি এবং স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যকার সম্পর্কে ফাটল তৈরি করে। বরং স্ত্রী থেকে স্বামীর দীর্ঘ সময়ের জন্য দূরে থাকা অনেক সময়ই স্ত্রীকে ভ্রষ্টতা ও বিচ্যুতির পথে ঠেলে দেয়। বহু নারীর অন্যায় ও গর্হিত কাজে লিপ্ত হওয়ার কারণ তাদের স্বামীরা দীর্ঘদিন তাদের থেকে দূরে আছেন। তেমনই এক নারীর বক্তব্য– আমার স্বামী পাঁচ বছর যাবৎ সফরে আছেন। এই দীর্ঘ সময়ে আমি তাকে একবার চোখের দেখাও দেখতে পাইনি।

আরেকজনের বক্তব্য– আমার স্বামী বিগত দশ বছর যাবত আমার সঙ্গে মিলিত হন না।

আল্লাহর বান্দা! এগুলো কি বিবেকসম্মত কথা? মেনে নেওয়ার মতো বিষয়?! অনেক মানুষ –আল্লাহ ﷻ তাদের হেদায়েত দান করুন– সফরে বের হয় কিন্তু পরিবারে এমন কোনো মাল-সম্পদ রেখে যায় না, যা দিয়ে পরিবারের ভরণপোষণ ও ব্যয়ভার নির্বাহ করা যায়; কিংবা এমন কাউকে দায়িত্বও দিয়ে যায় না, যিনি তার অনুপস্থিতিতে তাদের দেখাশুনা করবে। আপনি কোনো কোনো পরিবারকে দেখবেন, যার কর্তা সফরে চলে গেছেন, কিন্তু তার ঘর খাবারশূন্য। অনেক সময় পান করার মতো পানিও থাকে না। পরিবারের বিভিন্ন জিনিস ক্রয়

করার প্রয়োজন, কিন্তু পয়সা নেই। কারণ, পরিবারকর্তা তাদের জন্য কিছুই রেখে যাননি, যা দিয়ে তাদের প্রয়োজন পূরণ করা যায়।

পরিবারের ছোট্ট শিশু অসুস্থ হয়, কিন্তু তারা এমন কাউকে পায় না, যে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাবে। কখনও বা যুবতী নারীকে একাকীই বের হতে হয় মধ্যরাতে– সন্তানকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে। রাস্তার অজানা-অচেনা গাড়িতে চড়তে হয়। অনেক সময় গাড়ির চালক হয় মানুষরূপী হিংস্র নেকড়ে। একদিকে একাকী অসহায় নারী অপরদিকে হিংস্র হায়েনার অত্যুগ্র কামনা– রাস্তাও ফাঁকা। প্রিয় পাঠক! এর পরের অংশ সম্পর্কে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করো না!

সন্তানাদি থেকে দূরে থাকার ক্ষতি

আমাদের বর্তমান সমাজে ছড়িয়ে পড়া বহু অঘটন ও বিপর্যয়ের কারণ পরিবার থেকে পরিবারকর্তার দূরে থাকা।

প্রিয় পাঠক!

এভাবে আমরা কোথায় যেতে চাচ্ছি? আমরা কি সেখানেই যেতে চাচ্ছি, যেখানে গিয়েছে ইউরোপ-আমেরিকা? কাফের-মুশরিকরা? আমেরিকাতে সন্তানাদি থেকে পিতার দূরে অবস্থান করাকে তাদের বড় বড় ও জাতীয় সমস্যার অন্যতম সমস্যা বলে মনে করা হয়। সেখানকার মাত্র ৫১% শিশু তাদের প্রকৃত পিতার সাথে বসবাস করে। তা ছাড়া সে দেশে অবৈধ যৌনকর্মের ফলে যে শিশুরা জন্মলাভ করে, তার সংখ্যা তাদের মোট শিশুদের ৩০%। উনিশ শ' ষাটের দশকে যেখানে তাদের দেশের ১৭% শিশু আপন পিতা থেকে দূরে থাকত, সেখানে মাত্র ত্রিশ বছরের ব্যবধানে সেই সংখ্যা গিয়ে দাঁড়িয়েছে ৩৮%-এ।

এ অবস্থা তাদের শিশুদের মনকে আবেগ-অনুভূতি ও কোমলতাশূন্য করে দিয়েছে; এ সকল ভালো গুণের পরিবর্তে তাদের অন্তরে জায়গা

করে নিয়েছে উচ্ছৃঙ্খলা, অসভ্যতা ও হিংস্রতা; সহিংসতা, নিষ্ঠুরতা ও পাশবিকতা। এমনকি অনেক শিশু তাদের জন্মদাতা পিতা-মাতাকেই হত্যা করে ফেলে। আর তাই তো তাদেরই (আমেরিকারই) একজন একটি বই-ই লিখতে পেরেছেন 'এতিম আমেরিকা' নামে। যে বই তাদের দেশে পিতামাতার অভিভাবকত্ব ও পরিচর্যাহীন বিপুল সংখ্যক শিশুর কথা জানান দেয়। সেখানকার শিশুরা এতিম; হয়তো মায়েরা সন্তানদের ছেড়ে চলে যায় অন্য কারও সাথে কিংবা পিতা ব্যস্ত থাকে বিভিন্ন কাজে বা সফরে।

এই বইয়ের ভাষ্যমতে– সেখানকার শিশুদের পিস্তল-রিভলবারের সঙ্গো পরিচয় ঘটে সন্তানদের থেকে পিতামাতার দূরে থাকার কারণে। মনোবিজ্ঞানীগণ সুদীর্ঘ পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার আলোকে জানিয়েছেন– একটি শিশুর পিতা যখন তার থেকে দূরে থাকে, তখন এক সময় শিশুর কল্পনাশক্তি নিজে নিজে অনেক কিছুই ভাবতে শুরু করে। প্রথমেই তার মস্তিষ্কে একটি গল্পের উদয় ঘটে। যেখানে একটি শিশু আছে। তার সাথে তার পিতাও আছেন। পিতা ছেলের জন্য বিভিন্ন খেলনা কিনে আনছেন। তাকে খেলতে দিচ্ছেন। তাকে নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় বেড়াতে যাচ্ছেন। এভাবে শিশুর মনে বিভিন্ন দৃশ্যকল্পের আনাগোনা চলতে থাকে। আর এভাবেই একটি শিশু তার বাস্তবতার ঘাটতিটুকু কল্পনায় পূর্ণ করার চেষ্টা করে। ফলশ্রুতিতে তার মাঝে বিভিন্ন মানসিক সমস্যা দেখা দেয়। মানসিক বিক্ষিপ্ততা, বিকারগ্রস্ততা, অনুভূতিহীনতা ও অস্থিরতার সৃষ্টি হয়।

তদ্রূপ সন্তানাদি থেকে পিতার দূরে থাকা সন্তানাদিকে সংকীর্ণমনা, সংকুচিত ও অথর্ব করে তোলে। বিভিন্ন অপরাধ ও মাদকের প্রতি আসক্ত বানিয়ে দেয়। জুলুম-অত্যাচার, বাড়াবাড়ি, যৌন সহিংসতা, ধর্ষণ, খুন ও আত্মহত্যার মতো জঘন্য অপরাধে অভ্যস্ত করে তোলে। আমেরিকাতে অল্পবয়স্ক তরুণ –যাদের বয়স ১৮ এর কম– তাদের হাতে নিহতের সংখ্যা ১৯৮৪ থেকে ১৯৯৪ ইং এর মধ্যে তথা মাত্র দশ

বছরের ব্যবধানে ১২৫% এ গিয়ে দাঁড়িয়েছে। এরা সকলেই সন্তানাদি থেকে পিতামাতার দূরে থাকার বলি; সন্তানাদির প্রতি অবহেলা, উদাসীনতা ও সঠিক পরিচর্যাহীনতার শিকার। এর খেসারত তাদের দিতে হয়েছে এবং দিতে হচ্ছে রক্ত, মাংস ও সুস্থতা বিসর্জনের মাধ্যমে– দ্বীন থেকে দূরে থাকার কারণে।

প্রিয় পাঠক!

আমরাও কি আমাদের সন্তানদের জন্য এমনটাই পছন্দ করব?

অতএব, হে পিতৃসকল! 'তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে [জাহান্নামের] আগুন থেকে রক্ষা কর।' [সূরা তাহরীম : ৬] তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন ও দূরে অবস্থান করা থেকে বিরত থেকে।

৬. পরিবারের দুর্বলদের প্রতি যত্নশীল হওয়া

প্রিয় পাঠক!

আল্লাহ ﷻ নারীকে সৃষ্টি করেছেন দুর্বল করে। তদ্রূপ পুরুষরাও জন্মপরবর্তী ও শিশুকালে দুর্বল থাকে। তা ছাড়া জীবনের শেষ প্রান্তে এসে আবারও দুর্বলতার শিকার হয়। বাকি থাকল জীবনের মধ্যবর্তী সময়টুকু; যৌবনকালটুকু। অনেক সময় সেটুকুতেও দুর্বলতা ভোগ করতে হয় নানা অসুখ-বিসুখ ও বিভিন্ন কারণে।

অতএব, একজন জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান গৃহকর্তা তার পরিবারে বিদ্যমান এ দুর্বলতাগুলোর প্রতি লক্ষ রাখেন; যত্নশীল থাকেন। তাদের প্রতি নম্র কোমল ও দয়ার্দ্র আচরণ করেন। তাদের যথাযথ সাহায্য-সহযোগিতা করেন। তাদের উপর এমন কিছু চাপিয়ে দেন না, যা তাদের সাধ্যাতীত বা তাদের জন্য কষ্টকর।

এ ক্ষেত্রে নবীজী ﷺ তাঁর পরিবার-পরিজনের ব্যাপারে খুব লক্ষ রাখতেন। এমনকি হজের মতো গুরুত্বপূর্ণ একটি বিধানের ক্ষেত্রেও

নবীজী তাঁর পরিজনের দুর্বলতার প্রতি লক্ষ রেখেছেন। তিনি তাঁর পরিবারের দুর্বল সদস্যদের রাতের বেলায়ই মুযদালিফা থেকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, যাতে মানুষের ভিড়ের মধ্যে পড়তে না হয়। যেমন, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﵄ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

أَنَا مِمَّنْ قَدَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ فِي ضَعَفَةِ أَهْلِهِ.

নবীজী ﷺ মুযদালিফার রাতে তাঁর পরিবারের যে সকল লোককে আগে পাঠিয়েছিলেন, আমি তাঁদের একজন। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৫৯৪, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২৯৩]

৭. ঘরের কাজে অংশগ্রহণ করা

এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ الْأَسْوَدِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ فِي بَيْتِهِ قَالَتْ كَانَ يَكُونُ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ تَعْنِي خِدْمَةَ أَهْلِهِ فَإِذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ.

আসওয়াদ ﵀ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আয়েশা ﵂-কে জিজ্ঞাসা করলাম, নবী কারীম ﷺ ঘরে থাকা অবস্থায় কী করতেন? তিনি বললেন, ঘরের কাজ-কর্মে ব্যস্ত থাকতেন। অর্থাৎ পরিবারবর্গের সহায়তা করতেন। তবে সালাতের সময় হলে সালাতের জন্য চলে যেতেন। [বুখারী, হাদীস নং ৬৪৪]

অপর এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, নবীজী ﷺ নিজেই কাপড় সেলাই করতেন, জুতা মেরামত করতেন এবং অন্যান্য পুরুষরা সাধারণত ঘরে যেসব কাজ করে তিনিও তা করতেন। [মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ২৪৯৪৭]

আরেক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, নবীজী ﷺ অন্যান্য মানুষের মতোই একজন মানুষ ছিলেন। নিজেই জামা-কাপড় পরিষ্কার করতেন, বকরির

দুধ দোহন করতেন এবং নিজের কাজ নিজেই করতেন। [সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস নং ৫৬৭৫]

এ বর্ণনাগুলো প্রমাণ করে, একজন মুসলিম পুরুষ, যিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-র আনুগত্য ও অনুসরণ করতে চান, তার জন্য উচিত– নিজ ঘরে-পরিবারে নারীদের-স্ত্রীদের সাহায্য করা; তাদের কাজে সহযোগিতা করা।

পরিবারকে সাহায্য করার বহু বিষয় ও পদ্ধতি রয়েছে

* ঘরের কিছু কিছু কাজে-কর্মে সহযোগিতা করে স্ত্রীকে কিছুটা বিশ্রামের ব্যবস্থা করে দেওয়া।

* স্ত্রী যেন স্বামীর মাঝে আদর্শ স্বামীর দৃষ্টান্ত খুঁজে পান, তিনি যেন উপলব্ধি করতে বাধ্য হন– স্বামী তার প্রতি যত্নশীল, মনোযোগী ও তার কাজে সাহায্যকারী।

* স্বামী বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন করবেন। অহংকার, ঔদ্ধত্য ও আত্মম্ভরিতা থেকে দূরে থাকবেন।

* বিলাসিতা, বিলাসী মন-মানসিকতা ও আয়েশী দৃষ্টিভঙ্গি সযত্নে পরিহার করে চলবেন। এমন বিলাসিতা ও আয়েশ থেকে দূরে থাকবেন, যার প্রতি আল্লাহ ﷻ-র নিম্নোক্ত বাণীতে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেছেন–

﴿وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ﴾

বিলাস-সামগ্রীর অধিকারী মিথ্যারোপকারীদের আমার হাতে ছেড়ে দিন। [সূরা মুয্যাম্মিল : ১১]

অতএব, বোঝা যাচ্ছে, পরিবার-পরিজনের কাজে সহযোগিতা করায় নিজের নফসের জন্য অনেক বড় তারবিয়াত ও পরিচর্যা রয়েছে।

৮. স্নেহ-মমতা ও সহানুভূতি প্রদর্শন

দয়া-অনুগ্রহ, স্নেহ-মমতা ও সহানুভূতি প্রকাশ পরিবারের প্রতি সদাচার ও উত্তম আখলাকের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ ﷻ তাঁর কিতাবে আমাদের জন্য একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন, যে ঘটনা প্রমাণ করে পরিবারের প্রতি নবীদের কতটা দয়া, মায়া ও সহানুভূতি ছিল। ঘটনাটি মুসা عليه السلام-র। আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেছেন–

﴿فَلَمَّا قَضٰى مُوْسَى الْاَجَلَ وَسَارَ بِاَهْلِهٖۤ اٰنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ نَارًا ۚ قَالَ لِاَهْلِهِ امْكُثُوْۤا اِنِّيْۤ اٰنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّيْۤ اٰتِيْكُمْ مِّنْهَا بِخَبَرٍ اَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُوْنَ﴾

অতঃপর মুসা যখন সেই মেয়াদ পূর্ণ করলেন এবং সপরিবারে যাত্রা করলেন, তখন তিনি তূর পর্বতের দিক থেকে আগুন দেখতে পেলেন। তিনি তার পরিবারবর্গকে বললেন, তোমরা অপেক্ষা কর, আমি আগুন দেখছি। সম্ভবত আমি সেখান থেকে তোমাদের কাছে কোনো খবর নিয়ে আসতে পারি অথবা কোনো জ্বলন্ত কাষ্ঠখণ্ড আনতে পারি, যাতে তোমরা আগুন পোহাতে পার। [সূরা কাসাস : ২৯]

লক্ষ করুন, পরিবারের প্রতি, স্ত্রীর প্রতি মুসা عليه السلام-র মায়া-মমতা ও সহানুভূতি কী পরিমাণ ছিল। পরিবারের প্রতি তিনি কতটা আন্তরিক, মনোযোগী ও যত্নশীল ছিলেন। তিনি তাঁদেরকে আগুন থেকে দূরে অবস্থান করিয়েছেন। কারণ, তিনি জানতেন না সেখানকার অবস্থা কী? সেখানে কে আছে? শত্রু না মিত্র? কল্যাণ না অকল্যাণ? আরও লক্ষ করুন, তিনি সেখানে গিয়েছেন জ্বলন্ত কোনো কাঠের টুকরো নিয়ে আসতে। যাতে এর দ্বারা তাঁর স্ত্রী উষ্ণতা ও তাপ গ্রহণ করতে পারেন। ঠান্ডার হাত থেকে রক্ষা পেতে পারেন।

প্রিয় পাঠক!

লক্ষ করুন, আল্লাহর নবী মুসা আলাইহিস সালাম স্বীয় স্ত্রীর জন্য তাপ ও উষ্ণতা ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য কতটা মনোযোগী, আন্তরিক ও আগ্রহী ছিলেন?

– কেন?

– কী কারণে?

– স্ত্রীর প্রতি মায়া-মমতা ও সহানুভূতির কারণে।

স্ত্রীর প্রতি, সন্তানাদির প্রতি কিংবা পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের প্রতি মায়া-মমতা ও সহানুভূতি প্রদর্শনের বিভিন্ন ধরন ও পদ্ধতি হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, তারা যখন অসুস্থ হবে, তখন শরয়ী ঝাড়ফুঁক ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা। যেমন, আয়েশা رضي الله عنها থেকে বর্ণিত–

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعَوِّذُ بَعْضَ أَهْلِهِ يَمْسَحُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى وَيَقُولُ اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبْ الْبَاسَ اشْفِهِ وَأَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا.

নবীজী ﷺ তার কোনো কোনো স্ত্রীকে সূরা নাস ও সূরা ফালাক পড়ে ডান হাত দ্বারা বুলিয়ে দিতেন এবং পড়তেন, হে আল্লাহ! মানুষের প্রতিপালক! কষ্ট দূর কর এবং শিফা দান কর। তুমিই শিফা দানকারী। তোমার শিফা ভিন্ন অন্য কোনো শিফা নেই। এমন শিফা দান কর, যা কোনো রোগ অবশিষ্ট রাখে না। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৪১১, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২১৯১]

সাহাবায়ে কেরাম رضي الله عنهم আজমাইন তাঁদের স্ত্রী-পরিজনকে ঝাড়ফুঁক শিক্ষাও দিতেন। যেমন, এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُثْمَانُ وَبِي وَجَعٌ قَدْ كَادَ يُهْلِكُنِي قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ امْسَحْهُ بِيَمِينِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَقُلْ أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ . قَالَ فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَذْهَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَا كَانَ بِي فَلَمْ أَزَلْ آمُرُ بِهِ أَهْلِي وَغَيْرَهُمْ.

উসমান ইবনে আবুল আস رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি [একবার] নবী কারীম ﷺ-র দরবারে এলেন। উসমান رضي الله عنه বলেন, তখন আমার শরীর ব্যথায় প্রায় মুমূর্ষ অবস্থা। [এমতাবস্থায়] নবী কারীম ﷺ আমাকে বললেন, তুমি সাত বার তোমার ডান হাত ব্যথার স্থানে বুলাতে থাক এবং বল–

أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ

[আমি যে ব্যথা অনুভব করছি, তা থেকে মহা সম্মানিত আল্লাহ ও তাঁর ক্ষমতার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি।] তিনি বলেন, অতঃপর আমি তাই করলাম। আল্লাহ আমার ব্যথা দূর করে দিলেন। পরে সর্বদা আমি আমার পরিজন ও অন্যদের এরূপ করার আদেশ দেই। [সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ৩৮৯১]

[টীকা– এ হাদীসটি সহীহ মুসলিমেও বর্ণিত হয়েছে। মুসলিমের ভাষ্য এরূপ–

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ الثَّقَفِيِّ أَنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعًا يَجِدُهُ فِي جَسَدِهِ مُنْذُ أَسْلَمَ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَعْ يَدَكَ عَلَى الَّذِى تَأَلَّمَ مِنْ جَسَدِكَ وَقُلْ بِاسْمِ اللَّهِ ثَلاَثًا. وَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَعُوذُ بِاللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ.

উসমান ইবনে আবুল আস আস-সাকাফী رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-র কাছে একটি ব্যথার অভিযোগ করলেন, যা তিনি ইসলাম গ্রহণের পর থেকে তাঁর দেহে অনুভব করছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন, তোমার শরীরের যে অংশ

ব্যথাযুক্ত হয়, তার উপর তোমার হাত রেখে তিন বার বিসমিল্লাহ বলবে এবং সাত বার বলবে–

أَعُوذُ بِاللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ

[আমি আল্লাহ এবং তাঁর ক্ষমতার আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যা আমি অনুভব করি এবং যা ধারণা করি তার অনিষ্ট থেকে। –সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২২০২]

পরিবারের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশের আরও মাধ্যম হল– তাদের উপস্থিতিতে-অনুপস্থিতিতে, সফরে-স্থিতিতে তাদের জন্য দোয়া করা। যেমন, সফরের দোয়ার ব্যাপারে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে–

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الأَهْلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالأَهْلِ.

হে আল্লাহ! আমাদের এই সফর আমাদের জন্য সহজ করে দাও এবং এর দূরত্ব কমিয়ে দাও। হে আল্লাহ! তুমিই [আমাদের] সফরসঙ্গী এবং পরিবারের তত্ত্বাবধানকারী। হে আল্লাহ! তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি সফরের কষ্ট, দুঃখজনক দৃশ্য এবং ফিরে এসে সম্পদ ও পরিবারের ক্ষতিকর পরিবর্তন থেকে। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৩৪২]

তা ছাড়া সেসকল দোয়া-দরূদ প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় আমাদের পাঠ করা উচিত, যেগুলো নবীজী ﷺ আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন। যেমন, আবদুল্লাহ ইবনে উমর رضي الله عنهما থেকে বর্ণিত–

لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَعُ هَؤُلَاءِ الدَّعَوَاتِ حِينَ يُمْسِي وَحِينَ يُصْبِحُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمَالِي اللَّهُمَّ

اسْتُرْ عَوْرَاتِي وَآمِنْ رَوْعَاتِي اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِي وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي وَمِنْ فَوْقِي وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي.

রাসূলুল্লাহ ﷺ সকাল ও সন্ধ্যায় উপনীত হয়ে এ দোয়াগুলো পড়া ছেড়ে দিতেন না : হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট দুনিয়া ও আখেরাতের নিরাপত্তা চাই। হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট ক্ষমা এবং আমার দ্বীন, দুনিয়া, পরিবার ও সম্পদের নিরাপত্তা চাই। হে আল্লাহ! আপনি আমার দোষ-ত্রুটিগুলো ঢেকে রাখুন এবং ভীতিপ্রদ বিষয়সমূহ থেকে আমাকে নিরাপদ রাখুন। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে হেফাজত করুন আমার সম্মুখ থেকে, আমার পিছন দিক থেকে, আমার ডান দিক থেকে, আমার বাম দিক থেকে এবং আমার উপর দিক থেকে। হে আল্লাহ! আমি আপনার মর্যাদার উসিলায় মাটিতে ধসে যাওয়া থেকে আপনার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি। [সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ৫০৭৪, সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ৩৮৭১]

প্রিয় ভাই আমার!

এ সকল দোয়া বারবার পাঠ করুন। এগুলোর মাধ্যমে তাদের জন্য দোয়া করুন। এ দোয়াসমূহ যদি জীবন্ত কলব থেকে বের হয়, হতে পারে এর মাধ্যমে আল্লাহ ﷻ সন্তান-সন্ততি ও পরিবার-পরিজনকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করবেন।

নারী এবং শিশুরা পুরুষদের সহানুভূতি, সহমর্মিতা এবং আদর-স্নেহ ও ভালোবাসার মুখাপেক্ষী। যখনই তারা এসব থেকে বঞ্চিত হবে, তখনই তারা এগুলো অন্যস্থানে তালাশ করতে উদ্যোগী হবে।

বহু শিশু একজন অজানা-অচেনা ও অপরিচিত পুরুষের সান্নিধ্যে গিয়েছে তার আদর-স্নেহ ও ভালোবাসার কারণে; তার হাদিয়া ও উপঢৌকনের কারণে। অতঃপর শিশু তার প্রতি ধাবিত হয়ে পড়েছে।

ফলশ্রুতিতে এক সময় লোকটি তার সম্মান ও সম্ভ্রমের উপরই আঘাত করেছে।

স্বামী-সোহাগ বঞ্চিত বহু নারী তার হারানো সোহাগ-প্রীতি ও অনুরাগ পেয়েছে পরপুরুষের কাছে। ফলে সে অবাঞ্চিত পুরুষের বাহুবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে, তার বুকে মাথা রেখে রাত কাটিয়ে সেই মাত্রা পূর্ণ করেছে। [নাউযুবিল্লাহ]

অতএব, সাবধান! প্রিয় মুসলিম ভাই আমার! আপনার পরিবার যেন আপনার আদর-সোহাগ ও স্নেহ-ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত না হয়। তাদের প্রতি আপনার এই আবেগ-অনুভূতি ও প্রেম-সোহাগের মাধ্যমে তাদের সামনে জাহান্নাম থেকে রক্ষা ও বেঁচে থাকার একটি পর্দা ও প্রতিবন্ধক রেখে দিতে পারেন।

৯. সংকট ও ভোগান্তিতে না ফেলা

পরিবার-পরিজনকে কষ্ট, অসুবিধা ও সংকটে না ফেলাও ব্যক্তির উপর তার পরিবারের হক। যেমন, নবীজী ﷺ ইরশাদ করেছেন–

> وَاللَّهِ لَأَنْ يَلِجَّ أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ فِي أَهْلِهِ آثَمُ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ أَنْ يُعْطِيَ كَفَّارَتَهُ الَّتِي افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ.
>
> আল্লাহর কসম! তোমাদের মাঝে কেউ আপন পরিজনের ব্যাপারে শপথকারী হলে আল্লাহর নিকট সে গুনাহগার হবে ওই ব্যক্তির তুলনায়, যে কাফ্ফারা আদায় করে দেয়, যা আল্লাহ তাআলা অপরিহার্য করে দিয়েছেন। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৬২৫, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৬৫৫]

উদাহরণস্বরূপ, কোনো ব্যক্তি যদি এই মর্মে কসম করে– আল্লাহর কসম! আমি তাদেরকে [পরিবারকে] একটি পয়সাও দিব না, তা হলে এটা ভুল। কেননা, স্ত্রীর জন্য খরচ করা স্বামীর উপর তার হকের অন্তর্ভুক্ত। তাই স্বামীর উপর আবশ্যক এই কসম ভেঙ্গে ফেলে তার

কাফফারা আদায় করে দেওয়া; এই কসমকে স্থায়ী না করা। অতঃপর পরিবার-পরিজনের জন্য তাদের প্রয়োজন অনুপাতে খরচ করা।

অনেকে মনে করেন, এ জাতীয় ক্ষেত্রে নিজ মত ও কথার উপর অটল থাকা পুরুষত্বের পরিচায়ক। এটা ভুল। নিঃসন্দেহে ভুল। মনে রাখবেন, এ ধরনের মানসিকতা স্পষ্ট গুনাহের দিকে নিয়ে যায়।

১০. কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকা

পুরুষের জন্য আবশ্যক হচ্ছে– পরিবার-পরিজনকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকা। চাই সে কষ্ট কথার মাধ্যমে হোক কিংবা কাজের মাধ্যমে। যেমন, হযরত হুযাইফা ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

> كَانَ فِي لِسَانِي ذَرَبٌ عَلَى أَهْلِي وَكَانَ لَا يَعْدُوهُمْ إِلَى غَيْرِهِمْ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيْنَ أَنْتَ مِنْ الِاسْتِغْفَارِ؟ تَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِيْ الْيَوْمِ سَبْعِيْنَ مَرَّةً.
>
> আমার পরিবারের প্রতি আমার জিহ্বা অসংযত হত। তবে সেটা তাদের অতিক্রম করে অন্যদের স্পর্শ করত না। বিষয়টা আমি নবীজী ﷺ-র নিকট উল্লেখ করলাম। তিনি বললেন, তুমি তোমার ইস্তিগফার থেকে কোথায়? দিনে সত্তরবার আল্লাহ ﷻ-র কাছে ইস্তিগফার করবে। [ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ৩৮১৭, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ২৩৩৮৮]

অতএব, কোনো পুরুষের যবান দ্বারা যদি তার পরিবারের উপর কোনো অন্যায় করা হয়, তাদেরকে কষ্ট দেওয়া হয়, তা হলে সেই পুরুষের জন্য আবশ্যক সেই যবান দ্বারা ইস্তিগফারে লিপ্ত হয়ে যাওয়া; ইস্তিগফারের মাধ্যমে কষ্টদান ও অন্যায়ের প্রতিবিধান করা।

১১. পরিবারের গোপন কথা সংরক্ষণ করা

একজন মুসলিমের উপর আবশ্যক তার পরিবারের গোপন কথা ও বিষয়াশয় গোপন রাখা। মানুষের সামনে প্রকাশ হতে না দেওয়া। না

আত্মীয়স্বজনের মাঝে, না বন্ধু-বান্ধবের মাঝে আর না অন্য কারও মাঝে। যেমন, আবু হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত এক হাদীসে নবীজী ﷺ ইরশাদ করেছেন–

هَلْ مِنْكُمُ الرَّجُلُ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ فَأَغْلَقَ عَلَيْهِ بَابَهُ وَأَلْقَى عَلَيْهِ سِتْرَهُ وَاسْتَتَرَ بِسِتْرِ اللَّهِ . قَالُوا نَعَمْ. قَالَ ثُمَّ يَجْلِسُ بَعْدَ ذَلِكَ فَيَقُولُ فَعَلْتُ كَذَا فَعَلْتُ كَذَا . قَالَ فَسَكَتُوا قَالَ فَأَقْبَلَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ هَلْ مِنْكُنَّ مَنْ تُحَدِّثُ . فَسَكَتْنَ فَجَثَتْ فَتَاةٌ عَلَى إِحْدَى رُكْبَتَيْهَا وَتَطَاوَلَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَرَاهَا وَيَسْمَعَ كَلاَمَهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُمْ لَيَتَحَدَّثُونَ وَإِنَّهُنَّ لَيَتَحَدَّثْنَهْ فَقَالَ هَلْ تَدْرُونَ مَا مَثَلُ ذَلِكَ . فَقَالَ إِنَّمَا ذَلِكَ مَثَلُ شَيْطَانَةٍ لَقِيَتْ شَيْطَانًا فِي السِّكَّةِ فَقَضَى مِنْهَا حَاجَتَهُ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ.

তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি, যখন সে তার স্ত্রীর নিকট গমন করে, তখন সে দরজা বন্ধ করে, নিজের উপর একটি পর্দা টানে এবং আল্লাহ ﷻ-র নির্দেশ মতো [স্ত্রীর সাথে মিলন পর্বে যা করে] তা গোপন করে? সাহাবীগণ বললেন, হাঁ। তিনি বললেন, এরপর এই লোকটি [স্ত্রীর সাথে মিলন শেষে] উঠে গিয়ে [অন্যের নিকট] বলে, আমি এটা করেছি, আমি এরূপ করেছি? বর্ণনাকারী বলেন, এ কথা শুনে সকলে চুপ হয়ে গেল। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর তিনি মহিলাদের সম্বোধন করে বললেন, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি, যে তার গোপন কথা [স্বামী-স্ত্রী মিলনের কথা] অন্য স্ত্রীলোকের নিকট বর্ণনা করে? এতদ্শ্রবণে তারাও নিশ্চুপ হয়ে গেল। অতঃপর জনৈকা যুবতী রমণী তার পায়ের পাতার উপর ভর করে, গর্দান উঁচু করে এ জন্য বসে, যাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে দেখতে পান এবং তার কথা শুনতে পান। এরপর সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, পুরুষেরা এরূপ বলে এবং মহিলারাও। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন,

তোমরা কি অবগত আছ, এটা কীসের সদৃশ? এরপর তিনি নিজেই বললেন, এর উদাহরণ হল ওই শয়তানের ন্যায়, যে একজন স্ত্রী শয়তানের নিকট গমন করে, এরপর সে তার কাছে নিজের প্রয়োজন পূর্ণ করে [সহবাস করে] আর লোকেরা স্বচক্ষে তা অবলোকন করে। [সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ২১৭৪]

১২. পরামর্শ করা এবং তাদের মতামত গ্রহণ করা

দাম্পত্য জীবন, পারিবারিক জীবন ও পরিবারের সদস্যদের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাদের সঙ্গে পরামর্শ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয়, কেউ কেউ পরিবারের সঙ্গে পরামর্শ না করা পর্যন্তই ক্ষান্ত থাকে না, বরং প্রথমে তাদের সঙ্গে পরামর্শ করে অতঃপর তাদের রায় ও মতামতের বিপরীতটা গ্রহণ করে।

কেউ কেউ আবার আরেকটু অগ্রসর হয়ে বলে– যদি তুমি যথাযথ পরামর্শ পেতে ও সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে চাও, তা হলে প্রথমে তোমার স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ কর, অতঃপর তার পরামর্শের বিপরীতটা গ্রহণ কর। তারা তাদের এ মতের স্বপক্ষে এ হাদীস (?) দ্বারা দলীল পেশ করে–

شَاوِرُوْهُنَّ وَخَالِفُوْهُنَّ ، فَإِنَّ فِيْ خِلَافِهِنَّ بَرَكَةً.

> তোমরা তাদের সাথে [নারীদের সাথে] পরামর্শ কর এবং তাদের মতামতের বিপরীতটা গ্রহণ কর; কেননা, তাদের মতের বিপরীতটা গ্রহণ করাতেই বরকত রয়েছে।

অথচ এটা কোনো হাদীস নয়। জাল, বানোয়াট কথা।

পক্ষান্তরে এর বিপরীতে আমাদের শরীয়তে এমন উদাহরণ রয়েছে, যা এ ধারণা ও বক্তব্যের সম্পূর্ণ বিরোধী। বরং নবীজী ﷺ তাঁর একজন স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করেছেন এবং ঠিক ওই সময়, যখন মুসলমানদেরকে ফেতনা প্রায় পেয়ে বসেছিল। এই উম্মতের

ঐতিহাসিক সংকটকালে। যেমন, মিসওয়ার ইবনে মাখরামা ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

لَمَّا فَرَغَ مِنْ قَضِيَّةِ الْكِتَابِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ قُومُوا فَانْحَرُوا ثُمَّ احْلِقُوا قَالَ فَوَاللَّهِ مَا قَامَ مِنْهُمْ رَجُلٌ حَتَّى قَالَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا لَمْ يَقُمْ مِنْهُمْ أَحَدٌ دَخَلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَذَكَرَ لَهَا مَا لَقِيَ مِنْ النَّاسِ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَتُحِبُّ ذَلِكَ اخْرُجْ ثُمَّ لَا تُكَلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ كَلِمَةً حَتَّى تَنْحَرَ بُدْنَكَ وَتَدْعُوَ حَالِقَكَ فَيَحْلِقَكَ فَخَرَجَ فَلَمْ يُكَلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ نَحَرَ بُدْنَهُ وَدَعَا حَالِقَهُ فَحَلَقَهُ فَلَمَّا رَأَوْا ذَلِكَ قَامُوا فَنَحَرُوا وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَحْلِقُ بَعْضًا.

[হুদায়বিয়ার] সন্ধিপত্র লেখা শেষ হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ [সাহাবায়ে কেরামকে] বললেন, তোমরা উঠ, কুরবানী কর এবং মাথা কামিয়ে ফেল। বর্ণনাকারী বলেন, আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ ﷺ তিন বার তা বলার পরও কেউ উঠলেন না। তাঁদের কাউকে উঠতে না দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ উম্মে সালামা ﵂-র কাছে এসে লোকদের এই আচরণের কথা বললেন। উম্মে সালামা ﵂ বললেন, হে আল্লাহর নবী! আপনি যদি তা-ই চান, তা হলে আপনি বাইরে যান এবং তাঁদের সাথে কোনো কথা না বলে আপনার উট আপনি কুরবানী করুন এবং ক্ষৌরকারকে ডেকে মাথা মুড়িয়ে নিন। সেই অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ ﷺ বেরিয়ে গেলেন এবং কারও সাথে কোনো কথা না বলে নিজের পশু কুরবানী করলেন এবং ক্ষৌরকারকে ডেকে মাথা মুণ্ডন করালেন। তা দেখে সাহাবীগণ উঠে দাঁড়ালেন, নিজ নিজ পশু কুরবানী করলেন এবং একে অপরের মাথা কামিয়ে দিলেন। [বুখারী, হাদীস নং ২৫৮১]

পরিবারের অভ্যন্তরে পুরুষের ফেতনা

বর্তমান যামানায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুরুষদের ব্যাপারে যে বিষয়টির আশঙ্কা করা হয়, তা হচ্ছে– তারা তাদের পরিবারকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষার পরিবর্তে উল্টো পরিবারের সদস্যরাই তাকে ফেতনায় ফেলে; বিভিন্ন জটিলতা ও সমস্যায় নিপতিত করে।

যেমন, হুযাইফা ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন–

> فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ تُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ وَالصَّوْمُ وَالصَّدَقَةُ وَالْأَمْرُ وَالنَّهْيُ.
>
> মানুষ নিজের পরিবার-পরিজন, ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, পাড়া-প্রতিবেশীদের ব্যাপারে যে ফেতনায় পতিত হয়, সালাত-সওম, সদকা, [সৎকাজের] আদেশ ও [অসৎ কাজের] নিষেধ তা দূরীভূত করে দেয়। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫২৫, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৪৪]

হাদীসে বর্ণিত 'মানুষের নিজের পরিবার-পরিজন ও সন্তান-সন্ততির ব্যাপারে যে ফেতনায় পতিত হয়' দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, পরিবারের সদস্যরা তাকে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত রাখে, আল্লাহ ﷻ-র আদেশ পালন ও আনুগত্য থেকে বিরত রাখে। ফলে দেখা যায়, পরিবারের সদস্যরা তার কোনো কোনো ওয়াজিব তরকের কারণ হয় কিংবা কোনো হারাম কাজে লিপ্ত হওয়ার মাধ্যম হয়।

যেমন, বর্তমানে আমাদের সমাজে-পরিবারে দেখা যায়, পরিবারের সদস্যরা পুরুষের জন্য আল্লাহ ﷻ-র আনুগত্য তরকের কারণ হয়। অনেক পুরুষ জামাতে সালাত আদায়ের ব্যাপারে গাফলতি করে পরিবারের সদস্যদের বিভিন্ন স্থানে পৌঁছে দেওয়া বা তাদের বিভিন্ন জরুরত পূরণ করতে ব্যস্ত থাকার কারণে। কিংবা পুরুষ নিজে তাদের সঙ্গে গল্পগুজব ও আড্ডায় লিপ্ত থাকার কারণে অথবা তাদের থেকে পৃথক হতে মন না চাওয়ার কারণে।

পরিবারের কারণে কখনও কখনও হারাম কাজে লিপ্ত হওয়ার একটি উদাহরণ এ-ও যে, অনেক পিতা সন্তানদের জন্য এমন গেইম কিনে আনেন, যাতে উলঙ্গপ্রায় নারীর ছবিসহ ধর্মীয় আকীদা-বিশ্বাসের সঙ্গে সাংঘর্ষিক বিভিন্ন বিষয় থাকে।

তদ্রূপ আপন ঘরে চরিত্রবিনাশী স্যাটেলাইট চ্যানেলগুলো ঢোকানো, যে চ্যানেলগুলো বহুমুখী ফেতনা ও অশ্লীলতাকে আমাদের ঘরের প্রতিটি কোনায় কোনায় পৌঁছে দিয়েছে– দিচ্ছে। যে চ্যানেলগুলো আমাদের ছেলেমেয়ে, সন্তানাদি ও স্ত্রী-পরিজনসহ পুরো সমাজ ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

যে মুসলিম ভাই এই মসিবতে নিপতিত তার প্রতি আহ্বান

আল্লাহ ﷻ-র দরবারে তাওবা করুন, অবস্থার পরিবর্তন ও সংশোধন করুন। ঘর থেকে ফেতনা-ফাসাদের যাবতীয় উপকরণ বের করে দিন। পরিবার-পরিজনকে ওয়াজ-নসীহত ও উপদেশ করতে থাকুন। আপনি নিজে পরিশুদ্ধ ও সংশোধন হওয়ার পর আপনার যাবতীয় অন্যায়-অবহেলা ও মন্দকর্মের প্রতিবিধান করুন– সালাতের মাধ্যমে, সিয়ামের মাধ্যমে, সদকার মাধ্যমে, সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করার মাধ্যমে। যেমনটা নবীজী ﷺ আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন।

পরিবারই যদি শত্রু হয় তা হলে করণীয় কী?

পিতা কখনও পরীক্ষায় পতিত হন তার ভ্রষ্ট, বিকৃত, বিভ্রান্ত, ধর্মদ্রোহী কিংবা কাফের সন্তানের কারণে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَنَادٰى نُوْحٌ رَّبَّهٗ فَقَالَ رَبِّ اِنَّ ابْنِیْ مِنْ اَهْلِیْ وَ اِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَ اَنْتَ اَحْكَمُ الْحٰكِمِیْنَ. قَالَ یٰنُوْحُ اِنَّهٗ لَیْسَ مِنْ اَهْلِكَ ۚ اِنَّهٗ عَمَلٌ غَیْرُ صَالِحٍ ٭ فَلَا تَسْـَٔلْنِ مَا لَیْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ؕ اِنِّیْۤ اَعِظُكَ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِیْنَ﴾

আর নূহ [عَلَيْهِ السَّلَامُ] তাঁর পালনকর্তাকে ডেকে বললেন, হে পরওয়ারদিগার! আমার পুত্র তো আমার পরিজনের অন্তর্ভুক্ত; আর আপনার ওয়াদাও নিঃসন্দেহে সত্য আর আপনিই সর্বাপেক্ষা বিজ্ঞ ফায়সালাকারী। আল্লাহ বলেন, হে নূহ! নিশ্চয় সে তোমার পরিবারভুক্ত নয়। নিশ্চয় সে দুরাচার। সুতরাং, আমার কাছে এমন দরখাস্ত করো না, যার খবর তুমি জান না। আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি, তুমি অজ্ঞদের দলভুক্ত হয়ো না। [সূরা হূদ : ৪৫-৪৬]

অনেক সময় স্বামী কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি হন তার অবাধ্য, পাপাচারী কিংবা আহলে কিতাব কাফের স্ত্রীর কারণে। যেমন, পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে—

﴿ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِیْنَ كَفَرُوا امْرَاَتَ نُوْحٍ وَّ امْرَاَتَ لُوْطٍ ؕ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَیْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَیْنِ فَخَانَتٰهُمَا فَلَمْ یُغْنِیَا عَنْهُمَا مِنَ اللّٰهِ شَیْـًٔا وَّ قِیْلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدّٰخِلِیْنَ﴾

আল্লাহ কাফেরদের জন্য নূহ-পত্নী ও লূত-পত্নীর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন। তারা ছিল আমার দুই ধর্মাপরায়ণ বান্দার গৃহে। অতঃপর তারা তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করল। ফলে নূহ ও লূত তাদেরকে আল্লাহর কবল থেকে রক্ষা করতে পারল না এবং তাদেরকে বলা হল, জাহান্নামীদের সাথে জাহান্নামে চলে যাও। [সূরা তাহরীম : ১০]

আয়াতে বর্ণিত দুই নারীর ‘খেয়ানত’ বলে তাদের শয্যাগত ও চারিত্রিক খেয়ানত উদ্দেশ্য নয়। কেননা, নবীগণের স্ত্রীরা অশ্লীল ও গর্হিত কাজে লিপ্ত হওয়া থেকে নিরাপদ। আর এটা নবীগণের সম্মানের কারণে। আল্লামা ইবনে কাসীর رحمه الله ইবনে আব্বাস رضي الله عنهما থেকে বর্ণনা করেছেন– এই দুই নারীর খেয়ানত ছিল– নূহ عليه السلام-র স্ত্রী নূহ عليه السلام-র বিভিন্ন গোপন বিষয় সম্পর্কে অবহিত হত। কেউ নূহ عليه السلام-র সাথে ঈমান আনলে এই স্ত্রী ওই সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গকে তা জানিয়ে দিত।

আর লূত عليه السلام-র স্ত্রী লূত عليه السلام-র কাছে কোনো মেহমান এলে সেই সংবাদ শহরবাসীদের জানিয়ে দিত, যারা ছিল অপকর্মে সিদ্ধহস্ত। [তাফসীরে ইবনে কাসীর : ৪/৫০৫]

যিনি এ ধরনের পরীক্ষায় নিপতিত, তার জন্য এ সমস্যার সমাধানকল্পে উচিত– তাদেরকে ওয়াজ-নসীহত ও উপদেশের মাধ্যমে বোঝাতে থাকা এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ পরিবারের অবস্থা ও পরিস্থিতি বুঝে উদ্যোগ গ্রহণ করা।

যদি বিষয়টি স্ত্রীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয় এবং তাকে কোনোভাবে কোনো উপায়েই বোঝানো না যায়, তা হলে তার সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটানো ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।

আর যদি বিষয়টি পিতামাতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়, তা হলে–

﴿وَاِنۡ جَاهَدٰكَ عَلٰۤى اَنۡ تُشۡرِكَ بِىۡ مَا لَيۡسَ لَكَ بِهٖ عِلۡمٌ ۙ فَلَا تُطِعۡهُمَا وَصَاحِبۡهُمَا فِى الدُّنۡيَا مَعۡرُوۡفًا﴾

পিতা-মাতা যদি তোমাকে আমার সাথে এমন বিষয়কে শরীক স্থির করতে পীড়াপীড়ি করে, যার জ্ঞান তোমার নেই; তবে তুমি তাদের কথা মানবে না এবং দুনিয়াতে তাদের সাথে সদ্ভাবে সহঅবস্থান করবে। [সূরা লুকমান : ১৫]

তা ছাড়া কোনো কাফের পরিবার বা ফাসেক পরিবারের সঙ্গো একজন মুমিনের আচরণ ও কর্মকুশলতার ধরণ কী হবে– তার শিক্ষা রয়েছে 'ধর্মযাজক ও বালকের ঘটনা'য় এবং 'আসহাবে উখদূদ' এর ঘটনায়।

– ঘটনা কী?

আগের যামানায় এক বাদশাহ ছিল। তার ছিল এক জাদুকর। বার্ধক্যে পৌঁছে সে বাদশাহকে বলল, আমি তো বৃদ্ধ হয়ে পড়েছি, সুতরাং একজন বালককে আপনি আমার কাছে প্রেরণ করুন, যাকে আমি জাদুবিদ্যা শিক্ষা দিব। অতঃপর জাদুবিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার জন্য বাদশাহ তার কাছে এক বালককে প্রেরণ করল। বালকের যাত্রাপথে ছিল এক ধর্মযাজক। বালক তার কাছে বসল এবং তার কথা শুনল। তার কথা বালকের পছন্দ হল। অতঃপর বালক জাদুকরের কাছে যাত্রাকালে সর্বদাই ধর্মযাজকের কাছে যেত এবং তার নিকট বসত। তারপর সে যখন জাদুকরের কাছে যেত, তখন সে তাকে মারধর করত। ফলে জাদুকরের ব্যাপারে সে ধর্মযাজকের কাছে অভিযোগ করল। তখন ধর্মযাজক বলল, তোমার যদি জাদুকরের ব্যাপারে ভয় হয়, তা হলে বলবে, আমার পরিবারের লোকেরা আমাকে আসতে দেয়নি। আর যদি তুমি তোমার গৃহকর্তার ব্যাপারে আশঙ্কা বোধ কর, তা হলে বলবে, জাদুকর আমাকে বিলম্বে ছুটি দিয়েছে। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩০০৫]

বর্তমান ফেতনা-ফাসাদের যামানায় এ ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন প্রায়ই হতে হয়, তাই এ জাতীয় সমস্যার মোকাবিলা কীভাবে করতে হয়, তা খুব ভালোভাবে আয়ত্ত ও রপ্ত করে রাখা উচিত।

এখানে মনে রাখতে হবে, যেকোনো ধরনের ভুল ও ফাসাদের কারণেই পরিবারের সদস্যদের পরিত্যাগ করা কিংবা তাদের সঙ্গো বিচ্ছেদ ঘটানো জরুরি বা আবশ্যক নয়। বরং যেকোনো বিষয়ের জন্যই নির্দিষ্ট কিছু সীমারেখা আছে। দায়িত্বভার ও দায়মুক্তিরও নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম-নীতি আছে। অতএব, স্ত্রীর সামান্য ভুলেই সংসার বিরান করে

দিবেন না। ছেলে-মেয়েদের ছোটখাটো ত্রুটিতেই তাদের থেকে বিমুখ হয়ে তাদেরকে স্থায়ীভাবে বিপথে ঠেলে দিবেন না। মানুষ মাত্রই ভুলত্রুটি হতে পারে। এমন নিখুঁত-নির্দোষ স্ত্রী কোথায় আছে, যে কখনও কোনো ভুল করে না। এমন পুরুষও বা কোথায় আছে, যে কেবল ভালো আর উৎকৃষ্ট গুণেই গুণান্বিত! যিনি কখনও কোনো দোষ করেন না!

তবে হ্যাঁ, একজন পুরুষ তার স্ত্রীকে পরিত্যাগ করতে পারবে তখন, যখন স্ত্রী জঘন্য কোনো অন্যায় করবে। যে অন্যায় দেখে চুপ করে থাকা যায় না। যেমন, সালাত না পড়া, সওম না রাখা, হজ ফরয হওয়া সত্ত্বেও হজ না করা কিংবা অন্য যেকোনো ধরনের জঘন্য ও গর্হিত কাজে লিপ্ত হওয়া ইত্যাদি। আল্লাহ ﷻ আমাদের সকলকে বুঝে-শুনে বিচক্ষণতার সাথে সকলকে দ্বীনের দাওয়াত দেওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন।

শায়খ মুহাম্মাদ সালেহ আল-মুনাজ্জিদ বর্তমান আরব বিশ্বের একজন জনপ্রিয় দাঈ আলেম। তিনি ১৯৬০ সালে সিরিয়ার হালব শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তবে বেড়ে উঠেন সৌদিআরবের রিয়াদ শহরে। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পড়াশোনা সেখানেই সমাপ্ত করেন। তারপর চলে যান 'খবার' শহরে। সেখানে বাদশা ফাহাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্র্যাজুয়েট হন।

সৌদিআরবের বিখ্যাত সব শায়েখদের কাছ থেকে ইলম চর্চার সুযোগ পান তিনি। তাদের সংস্পর্শে এসে আলোকিত হয়ে উঠে তাঁর জ্ঞানের ভুবন। এদের মধ্যে শায়েখ বিন বায, ইবনে উসাইমিন, আবদুলাহ ইবনে জিবরীন, সালেহ আল-ফাউযান প্রমুখের নাম সবিশেষ উলেখযোগ্য।

দাওয়াতের ময়দানে তিনি বেশ তৎপর। নানান বিষয়ের উপর তিনি বক্তব্য প্রদান করে থাকেন। এর পাশাপাশি অনলাইনে তিনি একটি প্রশ্নোত্তর বিষয়ক ওয়েব সাইট পরিচালনা করে থাকেন। যা খুবই জনপ্রিয় ও বিখ্যাত। জরিপ অনুযায়ী তার পরিচালিত এই সাইটটি বিশ্বের সবচে জনপ্রিয় ইসলামি সাইটগুলোর অন্যতম।

লেকচার প্রদানের পাশাপাশি লেখালেখিতেও সমান সরব তিনি। ইতোমধ্যেই তার বেশ অনেকগুলো গ্রন্থ প্রকাশিত হয়ে আরব বিশ্বে ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। এর মধ্যে কয়েকটি হল–

১. 'আরবাউনা নাসিহাহ লি ইসলাহিল বুয়ুত' (The Muslim Home - 40 Recommendations)
২. 'আল আসালিবুন নাবাবিয়্যাহ ফিত তাআমুলি মাআ আখতাইন নাস' (The Prophet's Methods for Correcting People's Mistakes)
৩. 'সাবউনা মাসআলাহ ফিস সিয়াম' (70 Matters Related to Fasting)
৪. 'যাহেরাতু যুআফিল ঈমান' (Weakness of Faith)

বর্তমানে তিনি উমর ইবনে আবদুল আজিজ মসজিদে ইমাম ও খতিবের দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছেন।

আমরা তাঁর নেক হায়াত কামনা করছি।